শচীন দেববর্মন

সরগমের নিখাদ

সংকলন-সম্পাদনা-ভূমিকা

আবুল আহসান চৌধুরী

শচীন দেববর্মন

ত্রিপুরার আগরতলার রাজপরিবারের সন্তান। জন্ম : ১ অক্টোবর ১৯০৬, কুমিল্লায়। ছোটবেলা থেকেই সংগীতের প্রতি প্রবল অনুরাগ। উপমহাদেশখ্যাত বেশ ক'জন সংগীতজ্ঞের কাছ থেকে তালিম নিয়ে প্রথমে গায়ক হিসেবে আত্মপ্রকাশ। বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসংগীত সংগ্রহ করে অনুকরণীয় ভঙ্গিতে সেগুলো গেয়ে পরিণত হন জীবন্ত কিংবদন্তী গায়কে। ত্রিশের দশকে চিত্রজগতে গায়ক ও সুরকার হিসেবে যোগদান । ১৯৪৪ সাল থেকে মুম্বাইতে স্থায়ীভাবে বসবাস। আশিটিরও বেশি হিন্দি ছবিতে সুরারোপ। 'সঙ্গীত-নাটক-আকাদমি পুরস্কার', এশিয়ান ফিল্ম্ সোসাইটির (লন্ডন) সম্মাননা ও ভারত সরকারের 'পদ্মশ্রী' উপাধি পেয়েছেন। মৃত্যু ১৯৭৫ সালের ৩১ অক্টোবর।

আবুল আহসান চৌধুরী

জন্ম ১৩ জানুয়ারি ১৯৫৩ কুষ্টিয়ার মজমপুরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতোকত্তর ও পিএইচডি। ৩২ বছর ধরে অধ্যাপনা পেশায়যুক্ত। বর্তমানে কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু এই গবেষক সাহিত্য-সংস্কৃতির নানা দুষ্প্রাপ্য ও অজ্ঞাত উপকরণ সংগ্রহ,উদ্ধার ও তা ব্যবহার করে থাকেন। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৭০। পেয়েছেন বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী

সরগমের নিখাদ
প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৪১৭, অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১১
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : কাইয়ুম চৌধুরী
সহযোগী শিল্পী : অশোক কর্মকার
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ১০০০

মূল্য : এক শ পঞ্চাশ টাকা

Sargamer Nikhad
by *Sachin Devbormon*
Published in Bangladesh by *Prothoma Prokashan*
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Price : Taka One Hundred Fifty Only

ISBN 978 984 8765 73 9

সম্পাদকের উৎসর্গ

মীরা দেববর্মন

সূচিপত্র

ভূমিকা : আবুল আহসান চৌধুরী ৯

মুখবন্ধ : কাইয়ুম চৌধুরী ২৩

প্রবেশক : সলিল ঘোষ ২৯

সরগমের নিখাদ ৪১

পরিশিষ্ট

শচীনকর্তার জীবনের শেষ পর্ব ৮৩

সরগমের নিখাদের প্রতিক্রিয়া [চিঠিপত্র] ৮৬

ছবি ৯৫

ভূমিকা

শচীন দেববর্মন (১৯০৬-১৯৭৫) এই পোশাকি নামটি 'শচীনকর্তা' নামের আড়ালে অনেকটাই চাপা পড়ে গেছে। আমজনতার কাছে তিনি মোটের ওপর 'শচীনকর্তা' নামেই পরিচিত। সব মিলিয়ে তাঁর যে জীবন, তা যেন অনেকটাই উপন্যাসের বিন্যাসে রচিত। ত্রিপুরার রাজপরিবারের সিংহাসনবঞ্চিত শরিকদের সন্তান তিনি। পিতা স্বেচ্ছানির্বাসনে বসতি গড়েন কুমিল্লা শহরে, অনেকটাই ক্ষোভ-অভিমান আর বিবাদ এড়াতে। রাজকীয় মহিমা-মর্যাদা বা উপাধি ছিল না, ঐশ্বর্যও ছিল না তেমন; তবে পরিবারের আভিজাত্যের অহংকার অনেকখানিই ছিল। এ বিষয়ে শচীনকর্তা স্মরণ করেছেন : 'রাজবাড়ির নিয়ম অনুযায়ী জনসাধারণের থেকে আমাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে গুরুজনেরা আমাদের শৈশব থেকেই সচেতন করে দিতেন। তাঁরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন, যাতে আমরা তাঁদের মতে যারা সাধারণ লোক তাদের সঙ্গে মেলামেশা না করি। আমি তাঁদের এ আদেশ কোনোদিনও মেনে চলতে পারিনি। কেন জানি না—জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গেই মাটির টান অনুভব করে মাটির কোলে থাকতেই ভালোবাসতাম। আর বড় আপন লাগত সেই সহজ-সরল মাটির মানুষগুলোকে, যাদের গুরুজনেরা বলতেন সাধারণ লোক। যা-ই হোক, অসাধারণের দিকে না ঝুঁকে আমি ওই সাধারণ লোকেদের মাঝেই নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে তাদের সঙ্গে এক হয়ে গেলাম শৈশব থেকেই।' (*সরগমের নিখাদ*)। এভাবেই জনবিচ্ছিন্নতার রাজ-ঐতিহ্য ভেঙেছিলেন শচীনকর্তা। মাটির সুরের গানের প্রতি অনুরাগ ও আকর্ষণ জেগেছিল এই 'সাধারণ মানুষ'দের সাহচর্যে এসেই। তাঁর শৈশবের গানের গুরু ছিলেন বাড়িরই দুই পরিচারক মাধব আর

আনোয়ার। তাঁদের কাছেই তাঁর লোকগানের হাতেখড়ি। গানের কান তৈরিতেও এই দুজনের কাছে তাঁর ঋণ কম নয়।

অবশ্য তাঁর রক্তে ছিল গান—ত্রিপুরা রাজ্য যে গানেরই দেশ, লোকের মুখে মুখে ফিরত এই কথা। শচীনকর্তার সূত্রেই এই জনশ্রুতি সম্পর্কে জানা যায়: '...সেখানকার রাজবাড়িতে রাজা, রানি, কুমার, কুমারী থেকে দাসদাসী পর্যন্ত সবাই গান গায়। গলায় সুর নেই, গান গাইতে পারে না—এমন কেউ নাকি সেখানে জন্মায় না। ত্রিপুরার ধানের খেতে চাষি গান গাইতে গাইতে চাষ করে, নদীর জলে মাঝিরা গানের টান না দিয়ে নৌকা চালাতে জানে না; জেলেরা গান গেয়ে মাছ ধরে, তাঁতিরা তাঁত বুনতে বুনতে আর মজুররা পরিশ্রম করতে করতে গান গায়। সেখানকার লোকেদের গানের গলা ভগবৎ প্রদত্ত। আমি সেই ত্রিপুরার মানুষ—তাই বোধ হয় আমার জীবনটাও শুধু গান গেয়ে কেটে গেল।' (*সরগমের নিখাদ*)। একটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন, গানের আগে ছিল আরেকটি পর্ব, 'বাঁশি বাজানোর দিনগুলি'। শচীন ভালো বাঁশি বাজাতেন, সেই চিরচেনা 'টিপরাই বাঁশি'।

দুই

উত্তরাধিকার সূত্রেই নিজেদের পরিবারে সংগীতের আবহ ছিল। এক অগ্রজ, কিরণকুমার ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারী। বাবা নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মন ছিলেন সংগীতগুণী, গানের বড় সমঝদার ও পণ্ডিত। তাঁর কাছেই আনুষ্ঠানিক গান শেখার সূচনা। যদিও সে সময়ে কুমিল্লায় গানের নামকরা ওস্তাদ দু-একজন থাকলেও শচীনকর্তা পিতাকেই যোগ্য শিক্ষক বিবেচনা করেছিলেন। কুমিল্লার স্কুল ও কলেজে পড়ার সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রেরণাও কিছু লাভ করেন শিক্ষক-সতীর্থদের কল্যাণে। আর কুমিল্লা শহরে সেসময় সংগীত ও সাহিত্যের অনুরাগী কয়েকজন কিশোর-তরুণ অজয় ভট্টাচার্য, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুবোধ পুরকায়স্থ, সুশীল মজুমদার, নারায়ণ চৌধুরী—তাঁদের সঙ্গ-সান্নিধ্যও তাঁর ভেতরের গানের মানুষটিকে জাগিয়ে তুলেছিল। উত্তরকালে এঁদের কেউ কবি ও গীতিকার, কেউ লেখক-সমালোচক, কেউ বা চলচ্চিত্রকার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কুমিল্লাতেই নজরুলের সঙ্গে পরিচয় আর ঘনিষ্ঠতার সুযোগ মেলে তাঁর। এভাবে কুমিল্লার মতো মফস্বল শহর থেকেই গানের প্রতি একটা প্রবল টান তাঁর তৈরি হতে পেরেছিল।

এরপর বিএ পাস করে ১৯২৪ সালে কলকাতায় যান এমএ পড়ার জন্য। ইংরেজি বিষয় নিয়ে ভর্তিও হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রথম দিকে লেখাপড়ায় কিছু

মনোযোগ থাকলেও পরে তা আর বজায় থাকেনি। গান শিখতে শুরু করেন সেকালের লোকপ্রিয় অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দের কাছে। শচীনকর্তার প্রবল নেশা ছিল তিনটি—খেলা, মাছ ধরা আর গান করা। কিন্তু কলকাতার জীবনে গানের স্বার্থে অপর দুটি শখকে বিসর্জন দিতে হয় তাঁকে। অবশ্য পরে বোম্বাইয়ের (বর্তমান মুম্বাই) প্রবাসজীবনে খেলা দেখা আর মাছ ধরার নেশা ফিরে এলেও নিজের খেলার শখটি আর মেটাতে পারেননি। যা-ই হোক, পারিবারিক চাপে কলকাতায় আবার নতুন করে আইন পড়ার দিকে ঝুঁকলেও সে বিষয়েও অল্পদিনেই উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। সহায়-সম্পত্তি পরিচালনার প্রয়োজনে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বাবার বিলেতে পাঠানোর প্রবল ইচ্ছা পূরণেও অনাগ্রহ প্রকাশ করেন—সেও ওই গানের জন্যই।

উচ্চাঙ্গসংগীতে তালিম নেওয়ার জন্য কিছুকাল ওস্তাদ বাদল খাঁ, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর কাছে নাড়া বাঁধেন। এরপর গান শিখতে শুরু করেন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। কিন্তু একটা সময়ে গুরু-শিষ্যের সৌহার্দ্যের সম্পর্কে অনেকখানিই চিড় ধরে। কিছু কিছু কারণে ভীষ্মদেব শচীনকর্তার প্রতি অপ্রসন্ন হলেও তিনি গুরুর প্রতি কখনো শ্রদ্ধা হারাননি। অনেকটা স্বাবলম্বী মনোভাবের জন্য জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে শচীনকর্তা গান শিখিয়ে কিংবা নানা অনুষ্ঠানে গান গেয়ে উপার্জন শুরু করেন। কলকাতার বাড়িতে 'সুরমন্দির' নামের একটি গানের স্কুলও খুলেছিলেন। গানের আড্ডাও বেশ জমত সেখানে। কলকাতায় এক জজ সাহেবের নাতনি মীরা ধরকে গান শেখাতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে গভীর অনুরাগের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দুজনের বয়সের ব্যবধান থাকলেও প্রবল প্রণয়ের টানে তাঁদের বিয়ে আটকায়নি। ১৯৩৮ সালে শচীনকর্তার সংসারে প্রবেশ করে সংগীতগুণী মীরা তাঁর জীবনকে 'বর্ণে-গন্ধে-ছন্দে-গীতিতে' ভরিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। যথেষ্ট প্রতিভা থাকলেও হয়তো সংসারের সব দায়িত্ব নেওয়ায় গানের জগতে মীরা খুব বেশি দূর এগোতে পারেননি। তাঁর একক কয়েকটি এবং শচীনকর্তার সঙ্গে মিলে দুজনের কণ্ঠে চারটি গান রেকর্ডে বেরিয়েছিল। বিয়ের আগে বেতারে গান গেয়েছেন এবং নানা সংগীত সম্মিলনেও অংশ নিয়ে প্রশংসা কুড়িয়েছেন। বেশ কিছু গানও তিনি লিখেছিলেন। এসব গান শচীনকর্তার কণ্ঠে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

তিন

গানে বাঙালি শিল্পীদের বিকশিত হওয়ার একটা বড় সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল গ্রামোফোন রেকর্ডের মাধ্যমে। ১৯০২ সালে বিলেত থেকে গেইসবার্গ ও তাঁর সঙ্গীরা এসে সে সময়ের নামী শিল্পী গওহরজান, লালচাঁদ বড়াল—এঁদের কণ্ঠের

গান রেকর্ড করেন। সেই সূত্র ধরে এর পরপরই অনেক বিদেশি রেকর্ড কোম্পানি কলকাতায় এসে জড়ো হয়। পাশাপাশি উদ্যমী বাঙালিদের মধ্যেও কেউ কেউ রেকর্ড তৈরিতে এগিয়ে আসেন। তিরিশের দশকে বাঙালি মালিকানায় তিনটি স্বদেশি গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানি গড়ে ওঠে : জিতেন্দ্রনাথ ঘোষের 'মেগাফোন' (১৯৩২), চণ্ডীচরণ সাহার 'হিন্দুস্থান' (১৯৩২) ও বিভূতিভূষণ সেনের 'সেনোলা' (১৯৩৫)। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া তখনকার নিয়মানুসারে বেশির ভাগ শিল্পীই কোনো না কোনো কোম্পানির চুক্তিবদ্ধ শিল্পী হিসেবে কাজ করতেন। শচীনকর্তাও তেমনি বাঁধা পড়লেন হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানিতে। যদিও রেকর্ডে গান দেওয়া নিয়ে এর আগে শচীনকর্তার তিক্ত ও অপমানসূচক অভিজ্ঞতা হয়েছিল। 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস'-এ (এইচএমভি) তিনি যখন গান রেকর্ড করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যান, এইচএমভি তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিল তাঁর কণ্ঠের কথিত ত্রুটির কারণে, মানে অনুনাসিক স্বরের জন্য। যদিও উত্তরকালে এই ত্রুটিই শচীনকর্তার গুণ হয়ে উঠেছিল; বৈশিষ্ট্য হিসেবে সমাদর পেয়েছিল। বিলেত থেকে গান রেকর্ডিংয়ের বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে নামজাদা বাদ্যযন্ত্র ও গ্রামোফোন রেকর্ড ব্যবসায়ী এম এল সাহার পুত্র চণ্ডীচরণ সাহা কলকাতার ৬/১ অক্রূর দত্ত লেনে 'হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস অ্যান্ড ভ্যারাইটিজ সিন্ডিকেট লিমিটেড' নামের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এখান থেকেই বের হতো রাখালবালকের বাঁশি বাজানো ছবির লেবেল লাগানো 'হিন্দুস্থান রেকর্ড'। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ ও আনুকূল্য পেয়েছিল এই প্রতিষ্ঠান। ১৯৩২ সালের ৫ এপ্রিল হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টসের নিজস্ব স্টুডিওতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতা ও গান রেকর্ড করেন, তা দিয়েই হিন্দুস্থান রেকর্ডের যাত্রা শুরু। সেকালের অনেক নামী শিল্পী হিন্দুস্থান রেকর্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। নাম করতে হয় কৃষ্ণচন্দ্র দে, কুন্দনলাল সায়গল, শচীন দেববর্মন, পঙ্কজকুমার মল্লিক, সুধীরলাল চক্রবর্তী, দিলীপকুমার রায়, রেণুকা দাশগুপ্তা, সাবিত্রী দেবী, আঙ্গুরবালা, সুপ্রভা ঘোষ (সরকার), অনুপম ঘটক, রাজেশ্বরী বাসুদেব (দত্ত), অমিয়া ঠাকুর, শান্তিদেব ঘোষ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস এবং আরও অনেকের। মার্গ সংগীতের দিকপালেরাও তশরিফ এনেছিলেন অক্রূর দত্ত লেনের অপরিসর গলি পেরিয়ে হিন্দুস্থান রেকর্ডের গানের বাড়িতে। মনে পড়বে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ, শ্রীকৃষ্ণ রতনঝঙ্কার, পণ্ডিত দিলীপচাঁদ বেদী—এঁদের কথা। শচীনকর্তার প্রথম গানের রেকর্ড বের হয় এই হিন্দুস্থান রেকর্ড থেকেই। তিনি লোকগানে যেমন, আধুনিক গানেও তেমনই সুর ও গায়কিতে একটি নতুন 'ধরন' সৃষ্টি করেছিলেন। হিন্দুস্থান রেকর্ডের চুক্তিবদ্ধ শিল্পী হিসেবে বাংলা-হিন্দি সব মিলিয়ে তাঁর ১১২টি গানের রেকর্ডিং হয় এই প্রতিষ্ঠান থেকে। ১৯৩২ সালে ১১ নম্বর রেকর্ডে হেমেন্দ্রকুমার রায় ও শৈলেন রায়ের কথায় প্রথম তাঁর এই গান

দুটি প্রকাশ পায়—'ডাকলে কোকিল রোজ বিহানে মাঠের বাটে যাই' ও 'এই পথে আজ এস প্রিয় করো না আর ভুল'। কালজয়ী এই শিল্পী প্রচুর ব্যবসা দিয়েছিলেন হিন্দুস্থান রেকর্ডকে। আজও শচীনকর্তার গানের আবেদন নতুন যুগের শ্রোতাদের কাছে নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। তাঁর গান নিয়ে হালে সুরস্মৃতির একটি অনবদ্য সিডি-অ্যালবাম বের করেছে হিন্দুস্থান রেকর্ড।

চার

তিরিশের দশককে বাংলা গানের স্বর্ণযুগ বলা যায়। গ্রামোফোন রেকর্ডের সৌজন্যে এত অসাধারণ শিল্পী তাঁদের কণ্ঠের সুরের মায়াজাল ছড়িয়ে দিয়েছেন, যার কোনো তুলনা হয় না। একেকজন শিল্পী আলাদা আলাদা গায়কির বৈশিষ্ট্যে বাঙালি শ্রোতাকে মুগ্ধ-অভিভূত করেছেন। এসেছেন গানের বাণী নিয়ে নতুন যুগের গীতিকার, তেমনই সুরসৃষ্টিতেও ভিন্ন ধরনের আবেদন তৈরি হয়েছে। শচীনকর্তাও এই সংগীতভুবনে এক নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে এসেছিলেন। লোকগান (মূলত ভাটিয়ালি), আধুনিক, রাগপ্রধান, ধর্মগীতির (বিজয়া-আগমনী) পাশাপাশি হিন্দি গান ও ভজনও রেকর্ড করেছিলেন। বাংলা ও হিন্দি দুই ভাষাতেই ফিল্মের গানও গেয়েছেন। তিনি নিজেই তাঁর গানের বিষয়ে বলেছেন, 'এই সময় থেকে আমি নিজে গানের সুর-রচনা করতাম এবং নিজেই গাইতাম।...এখন থেকেই নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করা, নিজের স্বতন্ত্র স্টাইলে সুর-রচনা করা আরম্ভ হল। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত এই পাঁচ-ছ বছরে লোকসংগীত ও ভারতীয় মার্গসংগীতের সংমিশ্রণে নিজস্ব ধরনে সুর-রচনা করলাম—যা অন্য কারো সঙ্গে মিলল না। এইভাবে আমি আমার নিজস্ব গায়কি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলাম।...আমার এক নিজস্ব শৈলী সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলাম এবং জনসাধারণের নিকট থেকে সমর্থনও পেয়েছিলাম আমার এই প্রচেষ্টায়, তাদের নিকট জনপ্রিয়তা ও সুনাম অর্জন করে।' (*সরগমের নিখাদ*)।

শিল্পী হিসেবে শচীনকর্তার নাম ছড়িয়ে পড়ার পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানির। বাংলা ও হিন্দি মিলিয়ে এলপিসহ মোটামুটি তাঁর গানের ৮৭টি রেকর্ড বেরিয়েছিল। বাংলা গানের মধ্যে আধুনিক ও লোকগান যেমন ছিল, তেমনই নজরুলগীতিও ছিল চারটি। কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্যের তথ্য অনুসারে সব মিলিয়ে রেকর্ডে তাঁর বাংলা গানের সংখ্যা ১৩১, এর মধ্যে একক ১২৭ ও দ্বৈতকণ্ঠে চারটি ('শচীনকণ্ঠ', *দেশ*, বিনোদন সংখ্যা ১৩৮৫)। কিন্তু আমাদের হিসাবমতে তা হবে ১৩২, যার মধ্যে একক ১৩০ ও দ্বৈতকণ্ঠে দুটি। হিন্দি গানের সংখ্যার হিসাবের বাইরে সেই সংখ্যা হবে ৪২। রেকর্ডে নজরুল ছাড়া হেমেন্দ্রকুমার রায়, অজয় ভট্টাচার্য, শৈলেন রায়, জসীমউদ্‌দীন, প্রেমেন্দ্র

মিত্র, রবি গুহমজুমদার, সুবোধ পুরকায়স্থ, মোহিনী চৌধুরী, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, মীরা দেববর্মনের লেখা গান তিনি গেয়েছেন। এসব গীতিকবির মধ্যে অজয় ভট্টাচার্যের সঙ্গেই শচীনকর্তার সবচেয়ে বেশি সখ্য ছিল। এরপর নাম করতে হয় সুবোধ পুরকায়স্থ ও বয়সে বেশ ছোট হলেও মোহিনী চৌধুরীর। নজরুলের সঙ্গ-সান্নিধ্য ও স্নেহ-প্রীতি লাভের কথাও স্মরণ করছেন তিনি: 'কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গেও দীর্ঘকাল ধরে আমার ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি আমাকে যথেষ্ট ভালোবাসতেন এবং আমি তাঁর স্নেহধন্য শিল্পী।...আমার গান ও সুর খুবই পছন্দ করতেন।...আমার নিজস্ব ধরনে গানে সুর দিয়ে তাঁকে যখনই শুনিয়েছি, উৎসাহিত করেছেন আমাকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায়। তাঁর রচিত গান রেকর্ড করতে আমাকে আদেশও দিয়েছিলেন। আমার জন্যই বিশেষভাবে সেগুলি রচনা করেছিলেন তিনি। আমি তা রেকর্ডও করেছিলাম এবং সব কটি গানই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল কাজীদার রচনার গুণে।...কাজীদার সঙ্গলাভ আমার জীবনের অন্যতম প্রধান ঘটনা।' (*সরগমের নিখাদ*)। রবীন্দ্রনাথকে ঘরোয়া পরিবেশে কাছ থেকে দেখেছেন এবং অতুলপ্রসাদ সেনকে গানও শুনিয়েছেন তিনি তবে এঁদের কোনো গান তিনি পরিবেশন কিংবা রেকর্ড করেননি। সম্ভবত তাঁর গলা রবীন্দ্রনাথ বা অতুলপ্রসাদের গান পরিবেশনের উপযোগী ছিল না বলে।

বেশির ভাগ গানই শচীনকর্তা নিজের সুরেই গেয়েছেন, কিছু গানের সুরস্রষ্টা নজরুল ও সুরসাগর হিমাংশু দত্ত। সুর যোজনার পাশাপাশি স্বরলিপিও তৈরি করতেন তিনি। *সুরের লিখন* নামে তাঁর করা ৫০০ গানের স্বরলিপি বৈশাখ ১৩৪৫ সালে প্রকাশিত হয় কলকাতার ডি এম লাইব্রেরি থেকে। 'ও কালো মেঘ বলতে পারো', 'স্বপন না ভাঙ্গে যদি', 'যদি দখিনা পবন', 'আলো-ছায়া দোলা', 'ঝুলনে ঝুলিছে শ্যামরায়', 'ওরে সুজন নাইয়া', 'তুমি নি আমার বন্ধু', 'বন্ধু বাঁশী দাও মোর হাতেতে', 'ফুলের বনে থাকো ভ্রমর', 'পিঞ্জরার পাখীর মত', 'তুমি যে গিয়াছ বকুল বিছানো পথে', 'প্রেমযমুনারি পারে মোর হিয়া কেঁদে মরে', 'কাঁদিব না ফাগুন গেলে', 'ছিল মাধবী রাতি গো', 'প্রেমের সমাধি তীরে', 'গোধূলির ছায়াপথে', 'আমি ছিনু একা বাসর জাগায়ে', 'এই মহুয়া বনে মনের হরিণ হারিয়ে গেছে', 'মলয়া চল ধীরে', 'তুই কি শ্যামের বাঁশীরে', 'বধূ গো এই মধুমাস', 'প্রেমযমুনায় হয়তো কেউ', 'হয় কি যে করি এ মন নিয়া', 'মালাখানি ছিল হতে', 'সেই যে দিনগুলি', 'ঝিলমিল ঝিলমিল ঝিলের জলে', 'মন দিল না বঁধু', 'বাঁশী শুনে আর কাজ নাই', 'বর্ণে-গন্ধে-ছন্দে-গীতিতে', 'বিরহ বড় ভালো লাগে', 'ঘাটে লাগাইয়া ডিঙ্গা', 'রঙ্গিলা রঙ্গিলা রঙ্গিলা রে', 'তাক্‌দুম তাক্‌দুম বাজাই', 'কে যাস্ রে ভাটি গাঙ্ বাইয়া'—শচীনকর্তার এসব গান সংগীতরসিক বাঙালিকে আজও স্মৃতিকাতর করে তোলে।

পাঁচ

সেকালে সব গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানিই প্রতি মাসে তাঁদের গানের তালিকা-পুস্তিকা বের করত। তাতে প্রকাশিত রেকর্ডের গানের বিবরণ যেমন থাকত, তেমনি উল্লেখযোগ্য শিল্পীদের পরিচিতিও মিলত। ১৯৩৬ সালের অক্টোবর *শারদীয় আনন্দ নিবেদন* নামে প্রকাশিত হিন্দুস্থান রেকর্ডের বিবরণীতে ওই মাসে প্রকাশিত সুরসাগর হিমাংশু দত্তের সুরে এবং অজয় ভট্টাচার্য ও বিনয় মুখোপাধ্যায়ের কথায় শচীনকর্তার 'মম মন্দিরে এলে কে তুমি', ও 'নতুন ফাগুনে যবে আজি ধরা চঞ্চল' গান দুটি সম্পর্কে বলা হয়: 'কুমার শচীন্দ্র দেববর্মন শুধু বাংলা কেন সারা ভারতের সংগীত রসগ্রাহী ব্যক্তিমাত্রেরই পরিচিত। তাঁহার এইবারকার গান দুইখানিতে সংগীতদেবতার আরতি সম্পূর্ণ করিয়া যথার্থই যেন মরুতে মলয়া বহাইয়াছেন।' শচীনকর্তার রেকর্ড সম্পর্কে এ রকম উচ্ছ্বসিত ভাষার বিজ্ঞাপন মাঝেমধ্যেই হিন্দুস্থান রেকর্ডের ক্যাটালগে প্রকাশ পেত। আসলে শচীনকর্তা বাংলা গানের রূপ ও রীতিতে নতুন ব্যঞ্জনা যোগ করেছিলেন, এনেছিলেন ভিন্ন আবহ। এ কথা সত্য যে, 'শচীন দেবের আবির্ভাবের জন্মলগ্নে ছিল একটি নতুন যুগ-প্রবর্তনার ইঙ্গিত, যা গতানুগতিক নয়, স্বাতন্ত্র্যে এবং স্বকীয়তার আপন মহিমায় উজ্জ্বল। এই পূর্বানুবৃত্তি পরিপন্থী-কালের গণ্ডীর অতিক্রম-অন্বিষ্ট সংগীত-চিন্তার মধ্যেই আছে শচীন দেববর্মনের নিজস্ব কৌলীন্য এবং সুর-সৃষ্টিতে নতুন যুগের সূচনা' (কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্য: 'শচীনকণ্ঠ', *দেশ*, বিনোদন সংখ্যা ১৩৮৫)।

নীরদ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানির প্রথম যুগের রেকর্ডিংয়ের যন্ত্রী। তাঁর এক স্মৃতিচর্চায় এই কোম্পানির পুরোনো দিনের অনেক অজানা কথার হদিস মেলে। শিল্পীর পাশাপাশি ব্যক্তি-শচীন দেববর্মন সম্পর্কেও অনেক কিছু জানা যায় তাঁর এই স্মৃতিচর্চা থেকে। শচীনকর্তা ছিলেন স্নেহশীল, প্রীতিময়, বন্ধুবৎসল, সমদর্শী একজন মরমি মানুষ। তিনি ছিলেন সবারই 'শুভাকাঙ্ক্ষী'। কর্মক্ষেত্রে একবার বিপন্ন হলে শচীনকর্তা কীভাবে তাঁকে উদ্ধার করেন, সেই বিবরণ দিয়েছেন নীরদবরণ। কলকাতায় এসে তখনো তেমন খ্যাতি ও পরিচিতি অর্জন করেননি, সেই কে এল সায়গলকে শচীনকর্তাই হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানিতে নিয়ে আসেন। শিল্পী হিসেবে শচীনকর্তার বৈশিষ্ট্য ও কৃতির ধারণা মেলে নীরদবরণের জবানিতে: 'আমি যখন শচীন দেববর্মণের রেকর্ড করতে আরম্ভ করি সেদিনকার কথা আমার সম্পূর্ণ মনে আছে। সে গান দুটি হচ্ছে, "তুমি যে গিয়াছ বকুল-বিছানো পথে" এবং "প্রেম যমুনার পারে"।...বাংলায় বিশেষত পূর্ববাংলায় যেসব লোকগীতি তখন প্রচলিত ছিল যেমন ভাটিয়ালি এবং আরো বিভিন্ন রকম লোকগীতি— সেই লোকগীতির সঙ্গে তিনি যেরকম দক্ষতার সঙ্গে

উচ্চাঙ্গসঙ্গীত মিশিয়ে একটা নতুন জিনিস তৈরি করেছিলেন, সেটা আমাদের সারা ভারতের সঙ্গীতজগতের একটা বিরাট অবদান' (সাপ্তাহিক *দেশ*, ১৬ পৌষ ১৩৮৯)। নীরদবরণ কথা প্রসঙ্গে আরও বলেছেন, 'সাংগীতিক নিবেদনের মধ্যে তাঁর দুটো জিনিস ছিল। প্রথম, আমরা দেখেছি লোকসঙ্গীতের সঙ্গে মার্গসংগীত মিশিয়ে তিনি অপূর্ব একটা জিনিস তৈরি করেছিলেন। দ্বিতীয়, আর একটা জিনিস করতে আরম্ভ করলেন, এখন যেটাকে আমরা রাগপ্রধান বলি। সেই রাগপ্রধান গানের প্রথম স্রষ্টাদের মধ্যে তিনিই বিশিষ্ট একজন। আরো পরের দিকে এল আধুনিক গান নিয়ে তাঁর বিশেষ রকম পরীক্ষা নীরিক্ষা।...এখন তো আমরা কত আধুনিক গান শুনতে পাচ্ছি। শচীনদেবও পরে অনেক আধুনিক গান নিবেদন করেছেন। কিন্তু যৌবনারম্ভে যখন তাঁর মন সঙ্গীতরসে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, একেবারে গানে গানে মিশে গিয়েছিল, তখন তিনি সঙ্গীত ছাড়া আর কোনো জিনিস চিন্তা করতেন না, সেইসময় তাঁর কাছ থেকে যেসব গান শুনতে পেলাম সেগুলি চিরকালের জন্য অমর হয়ে থাকবে' (সাপ্তাহিক *দেশ*, ঐ)।

শিল্পী হিসেবে শচীনকর্তার মূল্যায়ন অনেকেই করেছেন, নানা আঙ্গিকে, নানা অনুষঙ্গে। কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যে ভিন্ন তাৎপর্যের পরিচয় মেলে : 'For temperament 'mejaj' or 'tabiyat' as it is called, kumar sachindra Dev Burman is incomparable among the artists I have heard.'

ছয়

এই যে শচীনকর্তা, গান শেখার জন্য তিনি অনেক কষ্ট করেছেন, ত্যাগ স্বীকারও কম করেননি। এ কাজে তাঁর নিষ্ঠা ছিল উল্লেখ করার মতো। তাঁর এই চেষ্টার কথা আর শিল্পী হিসেবে মূল্যায়ন করে আব্বাসউদ্দীন আহমদ তাঁর *আমার শিল্পী জীবনের কথায়* বলেছেন, 'আর একটি শিল্পী আমাকে বড়ই মুগ্ধ করেছে। তিনি হচ্ছেন কুমার শচীন দেববর্মণ। জানি না তাঁর কণ্ঠে কী জাদু লুকানো আছে, ওর গান শুনলেই আমি যেন কোন্ দেশে চলে যেতাম। একবার শচীন দেববর্মণের সাথে দিনাজপুর শহরে একটা বৈঠকে গান গাইতে যাই। দু'দিন একসাথে একই ঘরে ছিলাম।...আমার ভাওয়াইয়া গান শুনে ভদ্রলোক পাগল। একটা গানের কলি দিনে ৫০ বার বলতেন আমাকে আওড়াবার জন্যে। "হলো না আব্বাস ভাই, ঐ যে জায়গাটায় কী করে গলাটা ভাঙলেন? হলো না আমার, আর একবার—প্লিজ!" এমনি করে গোসল করার সময়, ঘুমুবার আগে, বেড়াতে গিয়েছি সেখানেও, "গান আর একবার আব্বাস ভাই—ও মোর কালারে কালা!" গান শেখার কী আন্তরিকতা আর শিল্পীর জন্য কী প্রশংসা, কী দরদ যে তাঁর অন্তরে জমা করে রেখেছেন! সে সময়কার তাঁর গাওয়া "যদি দখিনা পবন

আসিয়া ফিরে গো দ্বারে", "এই মহুয়া বনে মনের হরিণ হারিয়ে গেছে", "কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া", "গোধূলির ছায়াপথে", "পম্পার ঢেউ রে" ইত্যাদি গান সংগীত-জগতে এক যুগান্ত সৃষ্টি করেছিল। এক কথায় তিনি বাংলা গানের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।'—এভাবেই ত্রিপুরার রাজ্যহারা যুবরাজ অবশেষে সংগীত-সাম্রাজ্যের যুবরাজ হয়ে উঠেছিলেন।

কিন্তু লোকগানের শিল্পী হিসেবে আব্বাসউদ্দীনের সঙ্গে শচীনকর্তার এক জায়গায় সামান্য হলেও মৌলিক পার্থক্য আছে। কিন্তু হেরফের সত্ত্বেও আব্বাসউদ্দীনের ভাওয়াইয়া গান ছিল মৃত্তিকাসংলগ্ন, কিন্তু শচীনকর্তার লোকগানে সেই তুলনায় কথা ও সুরে আধুনিকতার নাগরিক ছোপ খানিকটা পড়েছিল। হেমাঙ্গ বিশ্বাস এই দুজন সম্পর্কেই মন্তব্য করেছেন, 'এঁদের পরিবেশনায় শিক্ষিত "রেওয়াজী গলা"র সচেতন ভঙ্গিমা ছিল, যেজন্য হয়তো তা ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু তারা তো কোথাও মূল সুরের বিকৃতি করেননি এবং গ্রাম্য গায়কী ধরে রাখতে পেরেছিলেন' ('গানের বাহিরানা')। কথাটা হয়তো অসত্য নয়, অন্তত নাগরিক সংগীত-বোদ্ধা রাইচাঁদ বড়ালের এই মুগ্ধ মন্তব্য এর সমর্থন জোগাবে: 'তিনি [শচীন দেববর্মন] যখন তাঁর...নিজস্ব ঢঙে পল্লীগীতি গাইতেন তখন মনে হত আমি যেন কোন গ্রামেই আছি, আমি সে গ্রামের মাটির গন্ধ পাচ্ছি, নদীর জলোচ্ছ্বাস শুনতে পাচ্ছি' (*ভাটি গাঙ বাইয়া*, শ্যামল চক্রবর্তী)।

গ্রামোফোনের পাশাপাশি বেতারেও তিনি নিয়মিত গান করতেন। রঙ্গমঞ্চে নাটকের গানেও সুর যোজনা করে প্রশংসা পেয়েছেন। কলকাতা ও তার বাইরেও নানা সংগীত-জলসায় তাঁর উপস্থিতি প্রায় অনিবার্য ছিল বোম্বাই যাওয়ার আগ পর্যন্ত। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় সাক্ষ্য দিচ্ছেন, কলকাতার যেকোনো সংগীতের অনুষ্ঠানে শচীনকর্তা ছিলেন 'হায়েস্ট পেইড আর্টিস্ট' (*ভাটি গাঙ বাইয়া*, ঐ)।

সাত

শচীনকর্তা মানুষটি ছিলেন একটু বিচিত্র ধরনের। খেয়ালি, সরল, রঙ্গপ্রিয়, একগুঁয়ে—সেই সঙ্গে কিছুটা 'কৃপণ' নামও কিনেছিলেন। বেখেয়ালে ১০ টাকা মনে করে ১০০ টাকার নোট দিয়ে এসে মনভোলা মানুষটি স্ত্রীর তিরস্কার সহ্য করেন হাসিমুখে। হিন্দি ফিল্মে যখন কাজ করতেন, পারিশ্রমিক নিয়ে অন্য অনেকের মতো দর-কষাকষি করতেন না। আবার মোটরের তেল পুড়িয়ে গড়িয়াহাট পর্যন্ত যান এক ফেরিওয়ালা ছোকরার কাছে দেশি বিস্কুট কিনতে, কষে দরদাম করে তারপর কেনেন। বিহারের দুস্থ বানভাসি মানুষের সাহায্যের জন্য তাঁর কাছে গেলে নানা অজুহাতে ফিরিয়ে দেন। মাছ ধরতে গিয়ে খালি

হাতে ফিরলে সঙ্গীকে অনায়াসে 'অপয়া' সাব্যস্ত করেন। নিজের দল হারলে খেলার মাঠ থেকে ফিরে কথা বন্ধ রাখেন ভিন্ন দলের সমর্থক কোনো প্রিয়জনের সঙ্গে। শিল্পীদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি-অনুরাগ-প্রীতি-স্নেহ-মমতা পোষণ করে এসেছেন চিরকাল বড় গুণগ্রাহী ছিলেন। কত বাঙালি শিল্পীকে বোম্বাই নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিয়েছেন। সহশিল্পীর প্রতি অপরিসীম মমতা ও মনোযোগ ছিল তাঁর। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের তখন উঠতি বয়স, কলকাতার এক জলসায় গাইতে গেছেন—শীতের রাত, ডায়াসে বসে গাইতে কষ্ট হবে ভেবে শচীনকর্তা তাঁর গায়ের দামি শাল ডায়াসের চাদরের ওপর পেতে দিতে বলেন। এই গানের মানুষটি কখনো রাজনীতির ধারেকাছেও থাকেননি। কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আজীবন ছিন্ন হয়নি। প্রগিতিপন্থী সংস্কৃতিকর্মী ছিলেন, তা বেশ বোঝা যায়, যখন তথ্য মেলে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সঙ্গে একসময় তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ১৯৩৯ সালে তিনি এর লোকসংগীত শাখার সভাপতি ছিলেন। এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে তাঁর অভিজ্ঞতার পরিধি বেড়েছিল। স্মৃতিকথায় কবুল করেছেন: 'আইপিটি-র সঙ্গে জড়িত থাকাকালে বুঝতে পারলাম, ভারতবর্ষের লোকসংগীত কত বিচিত্র এবং বৃহৎ সংগীত সম্পদে পুষ্ট' (*সরগমের নিখাদ*)।

আট

কলকাতায় থাকতে কলের গানের রেকর্ডে শচীনকর্তা সফল ও জনপ্রিয় হয়েছিলেন। চলচ্চিত্রেও তাঁর গাওয়া গান সংগীতরসিকদের বেশ মনে ধরেছিল। কিন্তু বাংলা চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালক হিসেবে তিনি কোনোভাবেই সুবিধা করে উঠতে পারেননি। এ ক্ষেত্রে রাইচাঁদ বড়াল কিংবা পঙ্কজকুমার মল্লিকের কাছাকাছি পৌঁছানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফিল্মে তাঁর সুর সৃষ্টিতে দু-চারটি ভালো গান হলেও তিনি কলকাতায় এই মাধ্যমে কেন যে দাঁড়াতে পারেননি, সে রহস্যের কথা হয়তো বিষয়-অধিকারীরা ভালো জানবেন। অথচ তাঁর প্রতিভা ও প্রয়াসের তো কোনোই কমতি ছিল না! এই অসাফল্যের ফলেই কিছুটা অভিমান নিয়ে ভাগ্যের খোঁজে ১৯৪৪ সালে তিনি বোম্বাই চলে যান। কলকাতার বাংলা ছবি মুখ ফিরিয়ে নিলেও বোম্বাইয়ের হিন্দি ছবির জগৎ তাঁকে সম্মান-সমাদর-অর্থ-যশ-প্রতিষ্ঠা উজাড় করে দিয়েছিল। বাংলা মুলুক থেকে গিয়ে অহিন্দিভাষী একজনের পক্ষে বোম্বাইয়ে জায়গা করে নেওয়া কিন্তু সহজ ছিল না। তখন বোম্বাইয়ের ফিল্মের জগতে নৌশাদ, ফিরোজ শাহ মিস্ত্রি, কেশব রাও ভোলে, হাফিজ, নাদিম শেরওয়ানি, ও পি নায়ার, অনিল বিশ্বাস, মদনমোহন—এঁদের সংগীত পরিচালক হিসেবে কী দাপট, তা সবারই জানা। কিন্তু মূলত 'ফিল্মিস্থান'

ও 'নবকেতন'—এই দুটি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই ফিল্মের গানের জগতে নিজের আসন পাকাপোক্ত করে নেন। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে এক স্বতন্ত্র ফিল্মি-ঘরানা সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। এরই অনুষঙ্গে কখনো সুযোগমতো বাংলার লোকগানের সুরকেও মিশিয়ে দেন হিন্দি গানের সঙ্গে। পঙ্কজকুমার মল্লিকের একটি কথা এখানে স্মরণ করতে হয়। তিনি বলেছেন : 'ভারতীয় সঙ্গীত ও সিনেমাকে শচীন যা দিয়ে গেছে, তার পরিমাপ করা কঠিন। বিশেষত বোম্বাইকেন্দ্রিক হিন্দী চিত্রজগৎকে শচীন যে কী পরিমাণে উন্নত ও সমৃদ্ধ করে গেছে তা বলার নয়।' (*কুমার শচীন দেববর্মন জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ*, ত্রিপুরা সরকার)। মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, গীতা রায় (দত্ত)—এমন সব বাঙালি শিল্পীকে বোম্বাইয়ের ফিল্মের জগতে প্রতিষ্ঠা পেতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। মান্না দে তো স্পষ্টই স্বীকার করেছেন : 'শচীনদার কাছে আমার ঋণ অসীম, শচীনদাই প্রথম আমায় ভাল গান গেয়ে নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ দিয়েছিলেন।' (*জীবনের জলসাঘরে*)। তিন দশকেরও বেশি সময় প্রতাপের সঙ্গে এই বাঙালি সংগীত পরিচালক বোম্বাইয়ের হিন্দি ফিল্মের জগৎ শাসন করেছেন। শচীন দেববর্মন—শচীনকর্তা, এখানে এসে রূপান্তরিত হন এস ডি বর্মনে। কিন্তু জন্মভূমির মাটি থেকে অনেক দূরে গিয়ে তাঁর এই দেশজোড়া খ্যাতি তাঁকে কতটুকু তৃপ্তি-স্বস্তি-আনন্দ দিয়েছিল, তা যদি জানা যেত!

বোম্বাইয়ে যাওয়ার পর বাংলার সঙ্গে যোগাযোগ কমে আসে। বাংলা গানের রেকর্ড প্রকাশের সুযোগও আর আগের মতো থাকেনি। তবে একটি ব্যাপার ঘটেছিল, সেটি উল্লেখ করার মতো। যে এইচএমভি সংগীত জীবনের সূচনাপর্বে শচীনকর্তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারাই আবার ১৯৪৬ সালে তাঁকে সাদর আমন্ত্রণ জানায়। এরপর এইচএমভি থেকে শচীনকর্তার বেশকিছু বাংলা ও হিন্দি গানের রেকর্ড বের হয়। শচীনকর্তা পাকাপাকি বোম্বাই চলে যাওয়ার ফলে বাংলা গানের যে কত বড় ক্ষতি হয়ে গেল, সে কথা ভাবলে বাংলা গানের অনুরাগী শ্রোতার মন যে বিষণ্ন ও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে, তা সহজেই অনুমান করা চলে।

নয়.

'তিনি বাংলা গানের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন'—শচীনকর্তা সম্পর্কে আব্বাসউদ্দীনের এই সংক্ষিপ্ততম মন্তব্যের ভেতর দিয়েই বোঝা যায়, তিনি কত বড় মাপের শিল্পী ছিলেন। তাঁর গান শুনলে হারিয়ে যাওয়া একদা স্নিগ্ধ-সৌরভময় গ্রামের কথা মনে পড়ে যায়, কখনো দেশভাগের বেদনা কাঁটার মতো বেঁধে।

যুগন্ধর এই শিল্পী মনেপ্রাণে ছিলেন বাঙালি, আপাদমস্তক ছিলেন 'বাঙাল'। তাই অনেক দূরের বর্ণিল ছটার বিভ্রম জাগানো কোনো এক বেগানা শহরে বসেও স্বপ্ন দেখতেন তাঁর চিরকালের বাংলার। ফেলে আসা সেই হারানো বাংলার স্মৃতি তাঁকে দীর্ঘশ্বাস আর হাহাকারে ব্যাকুল করে তুলত; গানের ভেতর দিয়ে পৌঁছে যেতেন সেই উদার-শ্যামল স্মৃতিময় বাংলার বুকে :

সেই যে দিনগুলি
বাঁশি বাজানোর দিনগুলি
ভাটিয়ালির দিনগুলি
বাউলের দিনগুলি
আজও তারা পিছু ডাকে
কূলভাঙা গাঙের বাঁকে
তালসুপারির ফাঁকে ফাঁকে
পিছু ডাকে পিছু ডাকে :
শুনি তাক্‌দুম তাক্‌দুম বাজে বাজে ভাঙা ঢোল!
ও মন যা ভুলে যা কী হারালি ভোল রে ব্যথা ভোল॥
না না না তেমন তো ঢোল বাজে না,
গাজনে যে লাগতো নাচন মন তো তেমন নাচে না।
কই গেল সে ঢ্যাংকুড়কুড় ঢ্যাংকুড়কুড় বোল
কই গেল সে ড্যাংডা ড্যাডাং ড্যাংডা ড্যাডাং বোল॥
এই না পারে ঢোল বাজে রে ঐ পারে তার সাড়া,
মাঝখানে বয় থৈ থৈ থৈ নয়নজলের ধারা।
কই গেল সে গাঁয়ের মাটি কই সে মায়ের কোল
কই সে হাসি কই সে খেলা কই সে কলরোল॥

দশ

কুমিল্লা, কলকাতার পর শচীনকর্তার প্রায় সওর বছরের জীবনের শেষ পর্ব কাটে বোম্বাইয়ে। বছর চল্লিশেক আগে সাপ্তাহিক *দেশ* পত্রিকায় মোট আট কিস্তিতে (২ ফাল্গুন ১৩৭৬, ৯ ফাল্গুন ১৩৭৬, ১৬ ফাল্গুন ১৩৭৬, ২৩ ফাল্গুন ১৩৭৬, ৩০ ফাল্গুন ১৩৭৬, ৭ চৈত্র ১৩৭৬, ১৪ চৈত্র ১৩৭৬, ২১ চৈত্র ১৩৭৬) 'সরগমের নিখাদ' নামে ছোটো করে তার জীবনের এই তিন পর্বের কাহিনি শুনিয়েছেন। এই স্মৃতিকথা লেখার প্রণোদনা জুগিয়েছিলেন শচীনকর্তার কাছের মানুষ বোম্বাই প্রবাসী সলিল ঘোষ; তারই উদ্যোগে পত্রিকায় তা ছাপা হয়। শচীনকর্তার স্মৃতিকথা ছাপার আগে সলিল ঘোষ এর ভূমিকা হিসেবে *দেশ*-এ (২৪ মাঘ ১৩৭৬) একটি লেখা লিখেছিলেন। শচীনকর্তার আলাপচারী গদ্যের এই অন্তরঙ্গ স্মৃতিচারণ সহজেই

পাঠকের চিত্ত হরণ করেছিল। নানাজন *দেশ*-এর পাতায় চিঠিপত্র লিখে তাঁদের ভালো লাগার কথা জানিয়েছিলেন, কখনো বা স্মৃতিবিভ্রমের ত্রুটিও কেউ কেউ ধরিয়ে দিয়েছিলেন। এসব চিঠিপত্র 'আলোচনা' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। সলিল ঘোষের ওই লেখাটি 'প্রবেশক' শিরোনামে এ বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হলো। চিঠিপত্রগুলো পত্রস্থ হলো বইয়ের পরিশিষ্ট অংশে।

পুরোনো দিনের বাংলা গান নিয়ে কাজ করার সুবাদে শচীন দেববর্মনের 'সরগমের নিখাদ' নামের এই লেখাটি চোখে পড়ে। পত্রিকার পাতায় আবদ্ধ থাকায় এবং বই হয়ে বের না হওয়ায় অনেকেই এই লেখাটির সন্ধান পাননি, আর পেলেও তা পড়ার সুযোগ মেলেনি। সেকালের এক যুগন্ধর সংগীতশিল্পীর আত্মকথা বই হিসেবে বের করার গরজ শিল্পী নিজে বা তাঁর পরিবার দেখায়নি। গানের জগতের কেউ; সংস্কৃতিমান প্রকাশক কিংবা সংগীত নিয়ে যাঁরা কাজ করেন, কেউই এ বিষয়ে আগ্রহ দেখাননি, আমলে নেননি। অবশ্য এ ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম হিসেবে খগেশ দেববর্মনের নাম উল্লেখ করতে হয়। খগেশ দেববর্মনের বই শচীনকর্তার *গানের ভুবন*-এ সলিল ঘোষের ভূমিকাসহ শচীন দেবের 'সরগমের নিখাদ' অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ বই হিসেবে কখনো বেরোয়নি। এসব কারণেই 'সরগমের নিখাদ' বই আকারে বের করার কথা ভাবি। আলাপ করি চিত্রকর ও সংগীতপ্রেমী কাইয়ুম চৌধুরীর সঙ্গে; তিনি উৎসাহ জোগান এবং বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকে দিতে ও মুখবন্ধ লিখতে সানন্দে সম্মতি দেন। আর প্রথমা প্রকাশন আমার ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে এগিয়ে আসে। *প্রথম আলো* পরিবারের প্রধান মতিউর রহমানের গুণগ্রাহিতা, সাজ্জাদ শরিফের সমর্থন ও অরুণ বসুর তৎপরতার ফলে বইটি বেরোল। এই কাজে আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানির সাবেক ও বর্তমান দুই আধিকারিক শচীনকর্তার একনিষ্ঠ অনুরাগী দীপক দাশগুপ্ত ও সঞ্জীবকুমার মুখার্জির। সুরাজ-শ্রুতি-সদনের পরিচালক অমিত গুহের কথা তো সাত মুখে বলতে হয়—তাঁর ভান্ডার অকাতরে তিনি উজাড় করে দিয়েছেন বরাবরের মতো। স্মরণ করি বাংলা একাডেমীর পরিচালক অপরেশ কুমার ব্যানার্জির স্বতঃস্ফূর্ত সহায়তার কথা। আরও যাঁরা সহায়তা করেছেন, তাঁদের মধ্যে তপন বাগচী এবং মোঃ হোসাইনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। আর বলতে হয়, আমি যেখানে শিক্ষকতা করি, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক 'গানপাগল' কর্মকর্তা শহীদুল ইসলামের কথা। এই সঙ্গে আমার তথ্য সংগ্রহকাজের উৎসাহী সঙ্গী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক কর্মকর্তা শেখ জাকির হোসেনের কথা না বললেই নয়। অনুলিপির কাজটি করে দিয়েছেন আমার ছাত্র অধ্যাপক মাসুদ রহমান। নানা কাজে সহায়তার জন্য কলকাতার বন্ধুদের মধ্যে স্মরণ করি ড. স্বপন বসু, ড. দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ রায়, কাজল অধিকারী, রমেন সাহা, করুণাপ্রসাদ দে, সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

আর বিশেষ করে বলতে হয়, গানের নানা তথ্যের ভান্ডারি অ্যাডভোকেট লালিম হকের কথা।

এগারো

সরগমের নিখাদ-এর পরিশিষ্টে সংকলক-সম্পাদকের তরফে সংযোজিত হয়েছে শচীনকর্তার জীবনের শেষ পর্বের কথা, তাঁর স্মৃতিকথা প্রকাশের কালে পত্রিকায় পত্রস্থ পাঠক-প্রতিক্রিয়ার বিবরণ, শচীনকর্তার রেকর্ডের লেবেল ও কভার এবং তাঁর নানা চিত্রাবলি। শচীন দেববর্মন তাঁর স্মৃতিকথা শেষ করেছিলেন ১৯৭০ সালে। এর পরও তিনি পাঁচ বছরেরও কিছু বেশি সময় বেঁচে ছিলেন। এখানে তাঁর জীবনের সেই অসমাপ্ত অংশের কথা বলা হয়েছে। 'সরগমের নিখাদ' যখন পত্রিকায় বেরোচ্ছিল, সেই সময় এই লেখা সম্পর্কে বেশ কয়েকজন পাঠক তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে চিঠি লেখেন। এসব চিঠিতে কিছু তথ্যগত ভ্রম-নিরসনের উপকরণ এবং সেই সঙ্গে আছে ভালো লাগার প্রশংসাসূচক মন্তব্য। বইটিকে সমৃদ্ধ ও প্রামাণ্য করে তুলবে বলে কিছু তথ্যদলিল সংযোজিত হয়েছে। শচীনকর্তার নামের বানান সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা দরকার। 'বর্মন' ও 'বর্মণ'—এই দুই ধরনের বানানই প্রচলিত। অভিধানও 'বর্মণ'ই সমর্থন করে। তবে তাঁর রেকর্ড কভার ও সরগমের নিখাদ'-এ 'বর্মন' বানানই মুদ্রিত, সেই কারণে আমরা এই বানানটিই গ্রহণ করেছি।

বারো

প্রকাশের চল্লিশ বছর এবং মৃত্যুর পঁয়ত্রিশ বছর পর প্রথমা প্রকাশনার সৌজন্যে *সরগমের নিখাদ* বই আকারে প্রকাশ পেল। শচীনকর্তার জন্মের ১০৫ বছর পূর্তিতে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

আবুল আহসান চৌধুরী

মুখবন্ধ

বহুদিন আগে পড়া সাপ্তাহিক *দেশ* পত্রিকায় কুমার শচীন দেববর্মনের আত্মস্মৃতি 'সরগমের নিখাদ' পড়ে প্রচুর আনন্দ পেয়েছিলাম। ধারাবাহিক রচনাটির জন্য প্রতি সপ্তাহে উন্মুখ হয়ে থাকতাম। হঠাৎ একদিন স্মৃতিকথাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল। পুরোপুরি শেষ না করেই। কেন বন্ধ করা হলো, সেই কৈফিয়ত *দেশ* কর্তৃপক্ষ কীভাবে দিয়েছিল, তা আজ আর মনে নেই। অসমাপ্ত সেই স্মৃতিকাহিনিটি অন্যত্র প্রকাশিত হলেও পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য কেউ উদ্যোগ নেননি। শচীন দেব সম্পর্কে আমার ঔৎসুক্য সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। কুমিল্লা আমার কাছে বাড়ির কাছে আরশিনগর। অতি আপনজন মনে হতো শচীন দেবকে। যদিও তাঁকে কখনো চাক্ষুষ করিনি। কিন্তু শৈশবকাল থেকেই তাঁর নাম কর্ণকুহরে প্রবেশ করেছে। তাঁর কণ্ঠ তো বটেই। তবে আরেকটি কারণ ছিল, তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ১৯২১-২২ সালে আমার পিতার সহপাঠী ছিলেন। পিতার মুখে তাঁর নাম, তাঁর বংশপরিচয় এবং তিনি যে রাজকুমার, তা জানা হয়ে গিয়েছিল সেই শৈশবকালেই। তাঁর চলনে-বলনে রাজকুমারসুলভ কোনো অভিব্যক্তি অবশ্য ছিল না। সাধারণের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে ওঠবস করাই ছিল তাঁর চারিত্র্যিক বৈশিষ্ট্য। অবাক লাগত, রাজপুত্র হয়েও তিনি চাষাভুষা, মাঝিমাল্লাদের গান গাইছেন। আবিষ্ট হয়ে থাকতেন কীর্তন, ভাটিয়ালিতে। বাড়িতে সিঙ্গল স্প্রিং হিজ মাস্টার্স ভয়েসের কালো সুটকেস-সদৃশ কলের গান যখন এল, সঙ্গে শচীন দেববর্মনেরও দুটো রেকর্ড এসেছিল রাখাল বালকের বাঁশি বাজানো হিন্দুস্তান রেকর্ডের লেবেলে। তারপর ফি বছর একটি-দুটি করে রেকর্ড আমাদের সংগ্রহে আসতে লাগল। তাঁর সানুনাসিক

কণ্ঠে কী যেন এক মাদকতা মাখা! আর কারও কণ্ঠের সঙ্গে মেলে না। আমরা প্রেমে পড়ে গেলাম। শুধু তাঁর কণ্ঠ নয়, গানের সুর, গানের কথা—সব মিলিয়ে পুরো গানের নির্মাণ, এক কথায়, অনবদ্য। পরে জেনেছি, পুরো কুমিল্লা কম্পোজিশনে গান তৈরি হয়েছে। গানের কথা, সুর ও কণ্ঠে কুমিল্লারই তিন কৃতী সন্তান। গানের কথায় অজয় ভট্টাচার্য, সুরে হিমাংশু দত্ত সুরসাগর আর কণ্ঠে তো শচীন দেববর্মন। ভাবতে অবাক লাগে, রবীন্দ্র-নজরুলবলয়ে অবস্থান করেও এই ত্রয়ী বাংলা গানের জগতে একটি নতুন সংগীতশৈলী সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। আজও তাঁদের রচিত সংগীত শ্রবণে, মনে হয়, বাংলা গানে তাঁদের অতিক্রম করা দুঃসাধ্য।

প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের শিকার শচীন দেববর্মনের বাবা নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মন আগরতলা ছেড়ে কুমিল্লায় এসে বসবাস করতে শুরু করেন। সে সময় স্থানটির নাম ছিল চাকলা রোশনাবাদ। বর্তমানে উত্তর চর্থা। যে বাড়িটিতে শচীন দেববর্মন থাকতেন, সেটি এখন হাঁস-মুরগির খামার। এই কুমিল্লায় থাকাকালেই লোকসংগীতের সংস্পর্শে আসেন শচীন দেব। বিভিন্ন পালাপার্বণ উপলক্ষে আয়োজিত মেলা কিংবা উৎসবের প্রতি প্রবল টান তাঁকে লোকসংগীতের বিপুল ভান্ডারের মুখোমুখি করেছিল, যার প্রভাব তাঁর উত্তর-জীবনে আমরা দেখতে পাই। এরই মাঝে কুমিল্লার নবাববাড়ির কল্যাণে রাগসংগীতের সঙ্গেও তাঁর পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটেছিল, যার পরিধি বিস্তৃত হলো কলকাতা পর্যন্ত। সংগীত শিক্ষার আগ্রহে কৃষ্ণচন্দ্র দের সান্নিধ্যে এলেন। সংগীতগুরু হিসেবে পেলেন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, ওস্তাদ বাদল খাঁ সাহেবকে। এ সময়ই লোকসংগীতের সুরের সঙ্গে রাগসংগীতের মণিকাঞ্চনযোগ ঘটান শচীন দেব। কলকাতার বিভিন্ন সান্ধ্য-অনুষ্ঠানে তাঁর আবির্ভাব ঘটতে লাগল। তাঁর সানুনাসিক কণ্ঠের বাংলা গান শ্রোতাদের কাছে এক নতুন চমক নিয়ে এল। কলকাতার সংগীতরসিক-সমাজে শচীন দেব স্থান করে নিলেন নিজ প্রতিভাবলে। বেতার ও রেকর্ডের মাধ্যমে জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করলেও হিজ মাস্টার্স ভয়েস কেবল তার সানুনাসিক কণ্ঠের অজুহাতে তাঁর গীত গান রেকর্ড করতে অনীহা প্রকাশ করেছিল। অথচ সেই সানুনাসিক কণ্ঠই বাংলা গানে নতুনত্ব এনে দিল।

আগেই বলেছি কুমিল্লার ত্রয়ী কৃতী সন্তানের কথা। শচীন দেববর্মনের গাওয়া গানের গীত রচনায় ও সুর অজয় ভট্টাচার্য ও হিমাংশু দত্তের অবদান অনস্বীকার্য। শচীন দেবের প্রথম রেকর্ড ছিল হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা 'ডাকলে কোকিল রোজ বিহানে'। লোকগীতি অবলম্বনে গানটির সুর করেছিলেন শচীন দেব নিজেই। অন্য পিঠে ছিল শৈলেন রায়ের লেখা 'এ পথে আজ এসো প্রিয়'।

এটিরও সুর দিয়েছিলেন শচীন দেব। লোকগীতির সঙ্গে রাগসংগীতের সংমিশ্রণে তাঁর একটা নিজস্ব শৈলী তৈরির চেষ্টা প্রথম থেকেই ছিল এবং তিনি এই চেষ্টায় অত্যন্ত সফল হয়েছেন।

লোকশিল্প ও আধুনিক চিত্রভাষার সংমিশ্রণে অনেক দিন থেকে আমরা, চিত্রশিল্পীরা একটি নতুন চিত্রশৈলী আবিষ্কারের চেষ্টা করছি। একটি আধুনিক বাংলা চিত্রভাষা সৃষ্টি করার জন্য শিল্পাচার্য যে কাজটি শুরু করেছিলেন এবং একটা সম্ভাবনার ইঙ্গিতও তাতে পাওয়া গিয়েছিল—আমাদের দুর্ভাগ্য, সময়াভাবে তাকে তিনি চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেননি। আমার ধারণা, শিল্পাচার্য এ ব্যাপারে সফল হলে সেটা হয়তো চিত্রশিল্পের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হতো। বিস্মিত হতে হয়, চল্লিশের দশকেই বাংলা গানের আধুনিকতার সঙ্গে ঐতিহ্যের সংমিশ্রণে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন শচীন দেব। তাঁর গীত এবং অজয় ভট্টাচার্য রচিত 'জাগার সাথী মম', 'চম্পক জাগো জাগো', 'জাগো মম সহেলি গো', 'ওরে সুজন নাইয়া/ কোন বা কন্যার দেশে যাও রে/ চাঁদের ডিঙ্গি বাইয়া' এবং হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখায় 'ও কালো মেঘ বলতে পারো'—এরই উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

সরগমের নিখাদ-এ শচীন দেব নিজের গান সম্পর্কে বলেছিলেন, 'লোকসংগীত ও ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীতের সংমিশ্রণে একটি নিজস্ব গায়কী সৃষ্টি করেছি, যা বিদগ্ধজনের কাছে আদৃত হয়েছে।' শচীন দেববর্মনের আত্মকাহিনির ভূমিকার লেখক সলিল ঘোষ। তাঁর বয়ানে আমরা জানতে পারি, লোকসংগীত শচীন দেবকে কীভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং বাংলা গানে একটি নতুন শৈলী তৈরির চেষ্টা তাঁর কতটা গভীর ছিল। সলিল ঘোষ জানাচ্ছেন, 'একটু পরে মেঝেতে কার্পেটের ওপর বসে গান ধরলেন "সুবল বল বল বল চাই"। এক লাইন গেয়ে, গান থামিয়ে শচীনদা বললেন, "বুঝলে সলিল, গ্রাম্য কথাগুলি রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। এত দিন গ্রাম ছাড়া হয়ে থেকেও এখনো সেই কথাগুলি ঘুরেফিরে মনে আসে।"'

বর্তমান সংস্করণের সংকলক আবুল আহসান চৌধুরীও নানা তথ্য সন্নিবেশ করেছেন তাঁর ভূমিকায়, যা জানা থাকলে শচীন দেবের শিল্পসৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে সাহায্য করবে। আবুল আহসান চৌধুরী জানাচ্ছেন, এই যে শচীনকর্তা, গান শেখার জন্য তিনি অনেক কষ্ট করেছেন, ত্যাগ স্বীকারও কম করেননি। এ কাজে তাঁর নিষ্ঠা ছিল উল্লেখ করার মতো। তাঁর এই চেষ্টার কথা আর শিল্পী হিসেবে তাঁর কর্মের মূল্যায়ন করে আব্বাসউদ্দীন আহ্‌মদ তাঁর *আমার শিল্পী জীবনের কথায়* বলেছেন, 'আর একটি শিল্পী আমাকে বড়ই মুগ্ধ করেছে। তিনি হচ্ছেন কুমার শচীন দেববর্মন। জানি না তাঁর কণ্ঠে কী জাদু লুকানো আছে।

ওঁর গান শুনলেই আমি যেন কোন দেশে চলে যেতাম। একবার শচীন দেববর্মনের সঙ্গে দিনাজপুর শহরে একটা বৈঠকে গান গাইতে যাই। দুই দিন একসঙ্গে এক ঘরে ছিলাম।...আমার ভাওয়াইয়া গান শুনে ভদ্রলোক পাগল। একটা গানের কলি দিনে পঞ্চাশবার বলতেন আমাকে আওড়াবার জন্য। "হলো না আব্বাস ভাই, ঐ যে জায়গায় কী করে গলাটা ভাঙলেন? হলো না আমার, আর একবার প্লিজ!" এমনি করে গোসল করার সময়, ঘুমুবার আগে, বেড়াতে গিয়েছি সেখানেও, 'গান আর একবার আব্বাস ভাই—ও মোর কালা রে কালা!" গান শেখার কী আন্তরিকতা আর শিল্পীর জন্য কী প্রশংসা, কী দরদ যে তাঁর অন্তরে জমা রেখেছেন। সে সময়কার তাঁর গাওয়া "যদি দখিনা পবন আসিয়া ফিরে গো দ্বারে", "এই মহুয়া বনে মনের হরিণ হারিয়ে গেছে", "কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া", "গোধূলির ছায়াপথে", "পদ্মার ঢেউ রে" ইত্যাদি গান সংগীতজগতে এক যুগান্ত সৃষ্টি করেছিল।'

কবি জসীমউদ্‌দীনের সংগ্রহ 'নিশীথে যাইও ফুলবনে রে ভ্রমরা' এবং দুখাই খন্দকার ও জসীমউদ্‌দীনের মিলিত সংগ্রহ 'রঙ্গিলা রঙ্গিলা রঙ্গিলা রে/আমারে ছাড়িয়া বন্ধু কই রইলা রে' শচীন দেব তাঁর কণ্ঠে অমর করে রেখে গেছেন। লোকগীতির ইম্প্রোভাইজেশন 'ওরে সুজন নাইয়া/ কোন বা কন্যার দেশে যাও রে চাঁদের ডিঙি বাইয়া' একটি সার্থক রচনা। আগরতলায় থাকাকালীন সাহেব আলী নামের একজন পল্লিগায়কের সংস্পর্শে আসেন শচীন দেব, তাঁর গাওয়া অনেক গান নতুনভাবে নতুন করে রেকর্ডে গেয়েছেন তিনি। 'তুমি নি আমার বন্ধু', 'গৌররূপ দেখিয়া হইয়াছি পাগল', 'ওষুধ আর মানে না, চল সজনী যাইলো নদীয়ায়' এবং 'মন দুঃখে মরিরে সুবল' প্রভৃতি তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের অমর ঠুমরি 'ঝন ঝন ঝন পায়েল বাজে', অজয় ভট্টাচার্যের বাংলা রূপান্তরে 'ঝন ঝন ঝন মঞ্জীর বাজে' কী সার্থকতার সঙ্গে শচীন দেব গেয়েছেন! গীতিকার, সুরকারকেও শচীন দেব নিজের ধ্যানধারণা ব্যক্ত করে তাদের কাছ থেকে বের করে নিয়েছেন অনবদ্য সব গান, যা চিরদিনের, চিরকালের।

ব্যক্তিগতভাবে শচীন দেবের কিছু গান আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় শৈশবে, কৈশোরে এবং আপ্লুত হই সেসব গানের কথায়, সুরে ও গায়কিতে। রঙে, রেখায়, প্রয়োগে ক্যানভাসকে তাঁর গানের সমপর্যায়ে উদ্ভাসিত করার অক্ষমতায় আরও ঘনিষ্ঠ হই শচীন দেবের সঙ্গে। আবিষ্কারে সচেষ্ট হই কোথায় সেই রহস্য, যেখানে দেশজ উপাদানে সমৃদ্ধ তাঁর আধুনিক গান। শচীন দেবের সমস্ত গানের মধ্যে সুরে, রচনায়, গায়কিতে 'গোধূলির ছায়াপথে' গানটি আমার কাছে একটি অসাধারণ গান মনে হয়।

'তুমি যে গিয়াছ বকুল বিছানো পথে' আমাদের যৌবনে শোনা গান। শুনে রোমাঞ্চিত হতাম, মুগ্ধ হতাম, বারবার শুনতাম। একটি হিন্দি ছবিতেও তিনি প্রয়োগ করেছিলেন লতা মুঙ্গেশকর ও মোহাম্মদ রফির কণ্ঠে—'তেরে বিনা শুনি নয়না হামারে'। এ রকম অনেক বাংলা গান হিন্দিতে রূপান্তর করেছিলেন শচীন দেব। রবীন্দ্রনাথের 'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে' গানটির সুর প্রয়োগ করেছিলেন দেব আনন্দের *আফসার* ছবিতে সুরাইয়ার কণ্ঠে—'নয়না দিওয়ানে কোই নহি মানে'। খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

সুরাইয়ার কণ্ঠে আরেকটি গান সারা ভারত মাতিয়ে দিয়েছিল শচীন দেবের সুরে। আমার কাছেও গানটি অসাধারণ মনে হয়। এমন সুরসমৃদ্ধ হিন্দি গান আমি তন্ময় হয়ে শুনি—এ গানটিও খুব সম্ভব দেব আনন্দের *আফসার* ছবির, 'মন মোর হুয়া মাতওয়ালা, কিতন জাদু ডালারে, কিতনা জাদু ডালা'। এই গান কণ্ঠে ধারণ করে সুরাইয়াও অমর হয়ে আছেন।

বাবার চাকরির সুবাদে তখন সন্দ্বীপে থাকি। সেখানে আমাদের কলের গান ছিল, কিন্তু সন্দ্বীপে কোনো রেকর্ডের দোকান ছিল না। শীতের সময় একজন রেকর্ড বিক্রেতা নোয়াখালী সদর থেকে আসতেন শাড়ি কাপড়ের গাঁটরির মতো রেকর্ডের গাঁটরি নিয়ে। এসেই অনেক বস্তার মতো আমাদের বাসায়ও রেকর্ড সরবরাহ করতেন। বাবা দেখলেন, সেই বাঁশিবাজানো রাখাল বালকের লেবেলে হিন্দুস্তান রেকর্ডে শচীন দেব। এক পিঠে শৈলেন রায়ের লেখায় 'প্রেমের সমাধি তীরে—তাজমহল' অন্য পিঠে অজয় ভট্টাচার্যের লেখায় 'আমি ছিনু একা'। দুটো গানের সুর দিয়েছিলেন শৈলেশ দত্তগুপ্ত। আমাদের সংগ্রহে চলে এল রেকর্ডটি। বহুদিন পর সাইগলের কণ্ঠে 'কোনো বুঝাই রামা' গানটি 'আমি ছিনু একা' কথায় ও সুরে শুনি। সেবার আরও একটি রেকর্ড দেখেছিলাম শচীন দেবের। খুব সম্ভব প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি ছবির প্লেব্যাক, 'কী মায়া লাগলো চোখে—সকালবেলা'।

রাগপ্রধান বাংলা গানের একটা সুন্দর রেকর্ড বাবা সংগ্রহ করেছিলেন। সেই রেকর্ডের গান দুটি শচীন দেবের কোনো এলপি বা সিডিতে দেখি না। 'স্বপন না ভাঙে যদি, শিয়রে জাগিয়া রব', অন্য পিঠে 'আজি রাতে কে আমারে ডাকিলে প্রিয়'। তাঁর সেই সানুনাসিক কণ্ঠে অসাধারণ গায়কিতে এখনো শিহরিত হই।

কলকাতায় আশানুরূপ স্বীকৃতি পাচ্ছিলেন না শচীন দেব। অনেকটা অভিমানের বশেই চলে যান মুম্বাইয়ে। সেখানে কোনো রকম বেগ পেতে হয়নি গুণী সুরকার হিসেবে স্বীকৃতি পেতে। সারা উপমহাদেশে তাঁর প্রতিভা ছড়িয়ে পড়ল গায়ক-সুরকার হিসেবে। বিমল রায়ের *সুজাতা* ছবিতে স্বকণ্ঠে গাওয়া 'শুন মেরে বন্ধু রে,

শুন মেরে মিতওয়া' যেন কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার বেদনা। কলকাতায় ফিরে আসার চেষ্টা তাঁর বরাবরই ছিল। 'পরবাসে কেন গো রহিলে' গানটিতে শচীন দেবের সে বেদনাই যেন মূর্ত হয়ে ওঠে।

১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় শচীন দেব বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর প্রিয় কুমিল্লা, প্রিয় বাংলাদেশ ধর্ষিত হচ্ছে, সেই বেদনাবোধ থেকে তাঁর আগের গাওয়া 'তাকডুম তাকডুম বাজে, বাজে ভাঙা ঢোল' গানটি ঈষৎ পরিবর্তন করে নতুন করে গাইলেন, 'তাকডুম তাকডুম বাজে বাংলাদেশের ঢোল, ও মন যা ভুলে যা কি হারালি বাংলা মায়ের কোল'। স্ত্রী মীরা দেববর্মনের লেখা এ গান গেয়েই মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করলেন শচীন দেব। প্রিয় শহর কুমিল্লা, প্রিয় বন্ধু-সান্নিধ্য, স্মৃতিতাড়িত শচীন দেব ভুলে যেতে চাইলেন এই বলে 'ও মন যা ভুলে যা কি হারালি, ভোল রে ব্যথা ভোল'—আমাদেরও ব্যথাতুর করে তোলে।

সরগমের নিখাদ বইটির বর্তমান সংস্করণের সংকলক আবুল আহসান চৌধুরীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বিস্মৃতির অন্তরালে থেকে শচীন দেবকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তিনি। তাঁর লেখা এ বইয়ের ভূমিকা থেকে আমার জানা হলো অনেক অজানা তথ্য।

কাইয়ুম চৌধুরী

সরগমের নিখাদ

প্রবেশক

সলিল ঘোষ

[শ্রীশচীন দেববর্মনের আত্মকাহিনির ভূমিকা হিসেবে শ্রীসলিল ঘোষের এই লেখায় শিল্পীর জীবনের কয়েকটি ঘটনার কথা জানতে পারবেন পাঠক। তা ছাড়া শিল্পীর মেজাজ ও মানসিকতার অন্তরঙ্গ পরিচয়টিও এই রচনায় পরিস্ফুট]

মীরা বৌদি বললেন, 'কর্তা, আপনার কি এখন মুড আছে? সলিলকে আপনার সেই পুজোর গানগুলো শুনিয়ে দিন না।'

কর্তা তাঁর শীর্ণ শরীর আর রোগা হাড়জিরজিরে সরু লম্বা পা সোফায় উঠিয়ে মুখে পান রেখে কী যেন ভাবছিলেন। পরনে সিল্কের লুঙ্গি, গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি। কর্তার মুখে শিশুসুলভ সরল হাসি দেখা দিল। জবাব দিলেন, 'হারমোনিয়ামটা নামিয়ে দিতে বলো।'

একটু পরে মেঝেতে কার্পেটের ওপর বসে গান ধরলেন, 'সুবল বল বল বল চাই।'

এক লাইন গেয়ে গান থামিয়ে শচীনদা বললেন, 'বুঝলে সলিল, গ্রাম্য কথাগুলো রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। এত দিন গ্রাম ছাড়া হয়ে থেকেও এখনো সেই কথাগুলো ঘুরেফিরে মনে আসে। আমাদের দেশে 'চাঁই' কথাটা ব্যবহার হয়। যেমন, 'কোথায় হে চাঁই বল দেখি। আমি মীরাকে বলেছিলাম, এই কথাটা দিয়ে একটা গান লিখতে। তারই ফল এই গান আগামী পুজোতে বেরোবে।' ভাটিয়ালি সুরে কীর্তনের আখর দেওয়া গানটি সবাই এখন শুনেছেন।

গানের আনন্দ উপভোগ করা ছাড়াও আমি কিন্তু মনে মনে খুব গর্ব বোধ করেছিলাম সেদিন। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরকার সংগীতশিল্পী শ্রীশচীন দেববর্মন শুধু আমার জন্য বিশেষ করে গান করছেন একান্ত নিরালায় ৬৩ বছর বয়সে, সে পরম সৌভাগ্য ছাড়া আর কী বলা যায়। সেদিন এ রকম আরও কয়েকটি গান শচীনদার মুখে শুনেছিলাম, যার রেশ কখনো মুছে যাবে না আমার মন থেকে।

প্রায় ত্রিশ বছর মুম্বাইয়ে শচীনদা ও আমি দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জগতে বাস করলেও, আলাদা জগতে বিচরণ করলেও, সচরাচর আমাদের মধ্যে নিয়মিত কোনো দেখাশোনা না হলেও শচীনদা ও মীরা বৌদির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বা তাঁদের যে প্রীতি-স্নেহ আমি পেয়েছি, তার কারণ হলো আমার ছোট ভাই স্বর্গত শুভময়। শুভময়ই এই যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয় ঘটনাচক্রে। সে তখন মস্কোতে। শচীনদা ১৯৬১ সালে মীরা বৌদিসহ গিয়েছেন সেখানে আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিরূপে। সেখানে শুভময় ও তার স্ত্রী সুপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয় এবং তা হৃদ্যতায় পরিণত হয়। শুভময়ের ব্যবহার দুজনকেই মুগ্ধ করে। ফিরে এসে শচীনদা আমাকে সব খবর দেন। শুভময় তখন *দেশ* পত্রিকায় নিয়মিত 'মস্কোর চিঠি' লিখছে। শচীনদা শুভময়ের সব লেখা নিয়মিত পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই হলো সূত্রপাত।

তারপর যখনই শচীনদার কাছে গিয়েছি নানা রকম বাহানা নিয়ে, শচীনদা কখনো আমাকে হতাশ করেননি। সবাই জানেন, শচীনদার শরীর পাঁচ বছর ধরে খুব ভালো নেই। খুব নিয়মমতো চলেন। তাঁর কাজকর্মে, দৈনন্দিন জীবনে সর্বত্র রয়েছে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার ছাপ। মুম্বাইয়ের চলচ্চিত্রশিল্পে তাঁর মতো নিষ্ঠাবান নিয়মানুবর্তী শিল্পী আর নেই যদি বলি, তবে কোনো অত্যুক্তি বলে ভাববেন না। উনিও যখন কোনো কাজের জন্য আমাকে ডেকেছেন, সবকিছু ফেলে আমাকে ছুটে যেতে হয়েছে কাঁটায় কাঁটায়। সময় নির্ধারণ করে সময়মতো না গেলে বা কোনো কাজ কোনো দিন করে দেব বলে সময়মতো না দিলে শচীনদা অসন্তুষ্ট হতেন। তিনি নিজেও পারতপক্ষে কখনো কথার খেলাপ করেন না। ঠিক সময়মতো টেলিফোনে মনে করিয়ে দেবেন।

কয়েক বছর আগে (১৯৬৫ সালে) মুম্বাইয়ে বাংলাদেশের বাউল-সংগীতের একটি অনুষ্ঠান হয়েছিল, যাতে যোগ দিয়েছিলেন বাউল বৃন্দাবন দাস ও সনাতন দাসসহ আরও অনেকে। শচীনদাকে বলেছিলাম, 'আপনাকে এই অনুষ্ঠানে অবশ্যই আসতে হবে।' তাঁর শরীর তখন খুব ভালো নেই। চোখ,

হার্ট ইত্যাদির নানান গন্ডগোলে ভুগছেন। বেশি ঘোরাফেরা, রাতে দেরি করা—এসব সহ্য হয় না। ভেবেছিলাম, হয়তো আসতে পারবেন না। কিন্তু অনুষ্ঠানে ঠিক সময়মতো শচীনদা ও মীরা বৌদি এসে হাজির। ভেবেছিলাম, কিছুক্ষণ শুনে শচীনদা হয়তো চলে যাবেন। কিন্তু বৃন্দাবন দাসের পায়ের তালে তালে রসঘন সেই গান শচীনদাকে শেষ পর্যন্ত ঠায় বসিয়ে রাখল। পরে আমাকে বলেছিলেন, 'কান পাল্টাইয়া গেল, কান পাল্টাইয়া গেল।' শচীনদার সেই অপূর্ব বলার ধরন, প্রকাশ করার বিশিষ্ট ভঙ্গিমা। মুম্বাইয়ের চলচ্চিত্র জগতের এক ধরনের গান শুনে শুনে কান যখন পচে গিয়েছিল, তখন বাংলাদেশের মাটির আস্বাদ আনা এসব লোকসংগীত শচীনদার 'কান পাল্টে দিয়ে' তাঁকে বিহ্বল করেছিল। অভিভূত হয়ে সেদিন ছলছল চোখে আমাকে আরও বলেছিলেন, 'গান শুনতে শুনতে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল পূর্ব বাংলায় আমার প্রথম জীবনের নানা দৃশ্য ও স্মৃতি। কী আনন্দই না পেলাম এই গান শুনে!' আজ চলচ্চিত্র জগতে খ্যাতির শীর্ষে উঠে ১০০ শিল্পীসংবলিত বৃহৎ অর্কেস্ট্রার সংগীত পরিচালনা করেও বাংলাদেশের সহজ-সরল লোকসংগীতের আকর্ষণ তাঁর কাছে এতটুকুও কমেনি। আরেকবার ভারতীয় বিদ্যাভবনে একইভাবে তাঁকে অভিভূত হতে দেখেছিলাম শ্রীনির্মলেন্দু চৌধুরী ও বাউল শ্রীপূর্ণ দাসের গান শুনে।

আরেকবার মুম্বাইয়ে চারণকবি মুকুন্দ দাসের গানের আয়োজন হয়েছে। কলকাতা থেকে শ্রীসত্যেশ্বর মুখার্জি, শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখার্জি সদলবলে এখানে এসে দুটি অনুষ্ঠান করবেন। এ অঞ্চলে এমনকি বাঙালিদের মধ্যেও মুকুন্দ দাস বা তাঁর রচিত যাত্রাগান সম্পূর্ণ অপরিচিত। শ্রোতারা আগ্রহ দেখাবে কি না, কে জানে। শচীনদাকে ধরেছিলাম, এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করার জন্য। শচীনদা কখনো এসব সভা-সমিতি উদ্বোধন, পৌরোহিত্য পছন্দ করেন না। সব সময় এড়িয়ে চলেন। কিন্তু আমি যখন চারণকবি বিদ্রোহী মুকুন্দ দাসের নাম নিয়ে তাঁকে ধরলাম, আমাকে 'না' বলতে পারলেন না। 'আরে মুকুন্দ দাসের গান আমি ছেলেবেলায় শুনেছি, আমার খুব ভালো লাগে, নিশ্চয় শুনতে আসব।' আমি বললাম, 'শুধু শুনতে এলে চলবে না, আপনাকে প্রধান অতিথি হিসেবে মুকুন্দ দাস সম্পর্কে দু-চার কথা বলতে হবে।' শচীনদা আপত্তি জানালেন, 'আমি কি তোমাদের মতো বলতে-লিখতে পারি?' পরে তাঁকে রাজি করিয়েছিলাম, তিনি মুকুন্দ দাস সম্পর্কে কিছু আমাকে বলবেন, আমি অনুলিখন করে নেব এবং সেটা পড়লেই চলবে। বলা বাহুল্য, শচীনদার উপস্থিতি ওই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করেছিল বহুলাংশে।

এই অনুলিখন থেকেই আরম্ভ হয়েছিল শচীনদা ও মীরা বৌদির সঙ্গে তাঁর জীবনকাহিনি লেখা নিয়ে আমার আরেক দাবি। আমি একদিন শচীনদাকে বলেছিলাম, 'আপনি এখন সাধনা ও শিল্পীজীবনের চরম শীর্ষে। রাজপরিবারে জন্ম ও লালিত-পালিত হয়ে সব ত্যাগ করে একদিন বাউল সন্ন্যাসী হয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন সংগীত-সরস্বতীর সাধনায়। কঠোর সাধনা ও কষ্ট করেছেন প্রথম জীবনে, যার বিনিময়ে পেয়েছেন আজকের এই সাফল্য ও খ্যাতি। আপনার সেই কাহিনি শুনতে চাই, পাঠকদের জানাতে চাই। আপনি লিখে দিন বা আমাকে বলুন।'

শচীনদা মীরা বৌদির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এসব জটিল পরিস্থিতিতে বৌদি উদ্ধার না করলে দাদা একেবারে অসহায়। বললেন, 'মীরা দেখো, সলিল কী বলে, আমার জীবনী শুনতে চায়। আরে ছ্যা, আমার কি অত শত মনে আছে নাকি। মীরা বরঞ্চ অনেক কিছু গুছিয়ে বলতে পারবে আমার বিষয়ে।'

এই হলো শচীনদার জীবনকাহিনি সংগ্রহের সূত্রপাত। শচীনদার মুখে সে কথা পরে শুনবেন। তার আগে শচীনদার যে বৈশিষ্ট্য আমি লক্ষ করেছি, সে সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। সজল শ্যামলা বাংলার মাটির সৃষ্টি এই শিল্পী কঠোর প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে মুম্বাইয়ে এসে জটিল হৃদয়হীন শুষ্ক কঠিন চলচ্চিত্র জগতে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, রসের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছেন, কোথাও এতটুকু আপস না করে। শুধু তা-ই নয়, নিজের সত্তা সম্পূর্ণ বজায় রেখেছেন, এতটুকুও না বদলে গিয়ে। সে এক আশ্চর্য, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা ও ক্ষমতাশালী শিল্পী ছাড়া অন্য কারও পক্ষে সম্ভব হতো না। বাংলাদেশ থেকে আমরা হাজার হাজার বাঙালি, শত শত শিল্পী মুম্বাইয়ে এসেছি। অনেকেই এখানে এসে নিজেদের সত্তা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু শচীনদাকে কোনো কিছু—অর্থ, যশ, খ্যাতি, জনপ্রিয়তা বদলাতে পারেনি। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও শিল্পীমানসের কাছে অন্য সবাইকে সম্ভ্রমে মাথা নত করতে হয়েছে, বিশেষ করে চলচ্চিত্রশিল্পে, যেখানে প্রচলিত গড্ডলিকা প্রবাহের মধ্যে নিজেকে না ভাসিয়ে দিলে টিকে থাকা দায়। শচীনদা কিন্তু একান্ত নিজস্ব স্টাইল, চালচলন, পোশাক-আশাক, কথাবার্তা, চলাফেরা—সবকিছুতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, নিজস্ব ভঙ্গিতে চলচ্চিত্রশিল্পের এই গড্ডলিকা প্রবাহের মধ্যে থেকেও শরীরে, মনে কোনো পাঁক না লাগিয়ে সাফল্য, খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার চরম শীর্ষে আরোহণ করেছেন। এখানেই শচীনদা অনন্য।

বাংলাদেশের প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ শ্রীশার্ঙ্গদেব *দেশ* পত্রিকার ১৫.২.৬৯ সংখ্যাতে শচীনদার শিল্পীজীবন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখেছিলেন, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ: 'সমগ্র দেশের কাছে তিনি একটি আইডিয়ার প্রতীক। বাংলার কাব্যসঙ্গীতে রাগসঙ্গীতের প্রতিফলন নানাভাবেই ঘটেছে, কিন্তু শচীন দেববর্মনের কণ্ঠে রাগসঙ্গীতের আবেদন প্রকাশ পেল অনন্যভাবে এবং এমন একটা যুগে যখন বাংলার সঙ্গীত-জগতে রথী-মহারথীর অভাব ছিল না। যে সঙ্গীতবোধ এবং কলাচাতুর্যে এটি সম্ভব হয়েছিল তা সাধারণ শিল্পীর প্রতিভায় সম্ভব হয় না। অপরদিকে লোকসঙ্গীত এবং কাব্যসঙ্গীতের যে অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন সে বৃত্তান্তও বিস্ময়কর প্রতিভার নিদর্শন। লোকসঙ্গীতে তিনি যে আর্ট খুঁজে পেয়েছিলেন তা মানবচিত্তের চিরন্তন অনুভূতিতে সঞ্জীবিত। তাঁকে তিনি কাব্যসঙ্গীতে বহুভাবে প্রয়োগ করে মানবিক আবেদনে পূর্ণ করে রেখেছেন। আজও এই পরিণত বয়সে তিনি এদিকে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন তা আমাদের চমৎকৃত করে। বোম্বাইয়ের এই মিউজিক ডাইরেক্টরের কাছে আজও ভাটিয়ালী, পল্লীগীতির দিনগুলি ম্লান হয়ে যায়নি। আজও এক একটা গানে যখন তাদের প্রতিবিম্ব পড়ে তখন আমরাও তাঁরই মত বিহ্বল হয়ে পড়ি।

'কাব্যসঙ্গীতে একটা ইনটেলেকচুয়াল আন্দোলন জেগে উঠেছিল এই শতকের তিরিশ দশকে যার পুরোভাগে ছিলেন হিমাংশু কুমার দত্ত, সুবোধ পুরকায়স্থ, অজয় ভট্টাচার্য এবং শচীন দেববর্মন। এঁদের রচনা, সুরপ্রয়োগ এবং গায়নশিল্প সবই মূলত ছিল বুদ্ধি প্রণোদিত। জনপ্রিয়তার পরিচিত সড়কে এঁরা অতি সহজে পদক্ষেপ করেন নি। অথচ লোকরুচির প্রতি ছিল এঁদের অগাধ শ্রদ্ধা। এঁদের সহজাত প্রতিভার সঙ্গে, শিক্ষিত পটুত্বের সংযোগ হওয়াতে বাংলার কাব্যসঙ্গীতে একটা সার্থক এবং সফল ধারার প্রবর্তন ঘটেছিল যা অনায়াসেই এঁদের ব্যক্তিত্বকে জনমানসে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। এঁদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকেও শচীন দেববর্মনের একটি একক প্রচেষ্টা ছিল। সেটি হচ্ছে কাব্যসংগীতে লোকসঙ্গীতের মূল্যায়ন। রাগসংগীতের অতি দক্ষ শিল্পী হয়েও লোকসঙ্গীতের বহু দুর্লভ সুরমাধুর্য প্রকাশ করার জন্য তিনি ব্যাকুলতা অনুভব করতেন। অতএব রাগসঙ্গীত এবং লোকসঙ্গীত এই দুই বিষয়কে অধিকার করেই শচীন দেববর্মনের সংগীতচিন্তা বর্তমান। এই চিন্তা সুদীর্ঘ শিক্ষা, শ্রুতি, বৈদগ্ধ্য, অভিজ্ঞতা ও নিষ্ঠায়, সুপরিণত ও সুপরিকল্পিত। তাই বাংলায় শচীন দেববর্মন কেবলমাত্র একজন শিল্পী বলে পরিচিত নন, তিনি বোধকরি অাধুনিক কাব্যসঙ্গীতেরই প্রতীক।'

শার্ঙ্গদেব অতি সুন্দরভাবে শচীনদার সংগীতের মূল্যায়ন করেছেন স্বল্প কথায়। শচীনদার বিষয়ে লিখতে গিয়ে মনে পড়ছে বিভিন্ন সময়ে তাঁর নানা কথাবার্তা। তাঁর সহজ-সরল-সরস নানা প্রকাশভঙ্গি। আমার কাছে এসবের ভূরি ভূরি উদাহরণ রয়েছে। একদিন বিকেলে আমি শচীনদার বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম—অনেক দিন যাইনি, দেখা করে আসি, শচীনদা কেমন আছেন। শচীনদা কিন্তু আগে না জানিয়ে যখন-তখন কেউ আসে, অযথা সময় নষ্ট করে—এসব খুব পছন্দ করেন না। খ্যাতির চরম শীর্ষে জনপ্রিয় সুরকার—নানাজনে নানাভাবে জ্বালাতনও করে। কিন্তু আমি মাঝেমাঝে অজান্তে হঠাৎ যদি কখনো গিয়ে পড়েছি, তো শচীনদা কখনো অসন্তোষ প্রকাশ করেননি; খুশিই হয়েছেন। সেদিন বিকেলে গিয়ে দেখি, শচীনদা একা বসে আছেন খাবার টেবিলে, চেয়ারে পা গুটিয়ে বসে; পায়ে মোজা, পরনে লুঙ্গি, গায়ে চাদর জড়ানো। এক কাপ চা আর টোস্ট মধু দিয়ে খাচ্ছেন। মীরা বৌদি তখন কলকাতায়। টেবিলে ব্রাউন পেপার দেওয়া কভারে একটা খাতা পড়ে রয়েছে, ওপরে হিন্দিতে নাম লেখা, 'বিবাগী ভ্রমরা'। কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে খাতাটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এটা কি কোনো নতুন ছবির গল্প, সুর দিচ্ছেন?' শচীনদার নিজস্ব বাঙাল ভাষায় যা বলেছিলেন, তার মর্ম হলো, 'আর বোলো না, আমার একটা গল্প মনে ধরেছিল, সেটা এতে আছে। এক প্রযোজককে শোনালাম। তার ভালোও লাগল, কিন্তু বলে কিনা কিছু কিছু পাল্টাতে। আমি কোথায় গল্পের মধ্যে চন্দনের গন্ধ দিতে চাই; আর প্রযোজক কিনা ওর মধ্যে পিঁয়াজ-রসুনের গন্ধ দিয়ে ভরাতে চায়। আমি বলে দিয়েছি, আমার দরকার নেই, গল্প দেব না।' কী উপভোগই না করেছিলাম শচীনদার ওই বলার ধরন!

আরেক দিন মনে আছে, শচীনদার টেলিফোন পেলাম, 'তুমি একবার আসতে পারবে, একটা কাজ আছে, একটু সাহায্য করবে?' আমি একটু মজা করার জন্য বললাম, 'বলেন কী, আপনার যদি কিছু কাজে আসতে পারি, সে তো আমার সৌভাগ্য। ছেলেবেলায় আপনার সেই প্রথম রেকর্ড "ডাকলে কোকিল রোজ বিহানে" শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তখন থেকেই আমি আপনার ভক্ত, বহুকাল পর্যন্ত কোনো আলাপ না হলেও। এখনো গানটা পুরো মনে আছে। আমার হেঁড়ে গলায় আপনাকে শুনিয়েও দিতে পারি। সাহায্যের কথা কী বলছেন, আপনার হুকুম—কখন আসব, বলুন।' শচীনদা আবার ঘড়ি, টাইম, অ্যাপয়েন্টমেন্ট সম্পর্কে খুব সচেতন। সঠিক ঘণ্টা, মিনিট, টাইম দিয়ে দিলেন। বললেন, 'দেরি কোরো না, পরে আবার অন্যরা আসবে।' কাজ

তেমন কিছুই না। শচীনদার কাছে অনুরোধ এসেছে পত্রিকা সম্পাদকের কাছ থেকে, তাঁর লেখা একটা প্রবন্ধ চাই। শচীনদা সেটা মোটামুটি লিখেছেন। লেখাটা শুনে মতামত জানাতে হবে। ভালো কপি করে দিতে হবে। এই সামান্য ব্যাপারেও শচীনদা নিখুঁতভাবে সবকিছু করেছিলেন। তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতিকথার যে চিত্রটি তিনি ফুটিয়েছিলেন, তা খুবই মধুর।

চলচ্চিত্রের গল্প খোঁজার ব্যাপারে শচীনদার একান্ত নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি আরেক দিন যে কী উপভোগ করেছিলাম, বলার নয়। *দেশ* পত্রিকার সংযুক্ত সম্পাদক, আমার মেজদা শ্রীসাগরময় ঘোষ মুম্বাইয়ে বেড়াতে এসেছেন। শচীনদা বললেন, ওঁকে নিয়ে একদিন এসো। তাঁর সঙ্গে আমি কিছু আলোচনা করব। নির্দিষ্ট সময়ে আমরা পৌঁছালাম। নানা আলাপ-আলোচনা হলো সাগরদার সঙ্গে—কলকাতার ছাত্রজীবন, সংগীতে তিনি কী কী করতে চেয়েছেন, তাঁর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা—কোন তত্ত্ব তাঁকে পথ দেখিয়েছে ইত্যাদি। নানা বিষয়ে কত কী সব কথা হলো, আজ মনে নেই। কিন্তু দারুণ উপভোগ্য হয়েছিল সে আলোচনা। অনেক মূল্যবান কথা বলেছিলেন শচীনদা, যা সাগরদাকেই তাঁর 'বৈঠকি' লেখার মধ্য দিয়ে কোনো দিন প্রকাশ করতে অনুরোধ করব। কিন্তু শচীনদা গল্প খোঁজা সম্পর্কে যা বলেছিলেন, তা ভোলার নয়। 'আমার জন্য ভালো কিছু গল্প বা গল্পের বইয়ের সন্ধান দিন। দেব আনন্দ আমাকে মানে। ভালো গল্প পেলে ওকে অনুরোধ করব ছবি তুলতে। কিন্তু একটা কথা, এখানকার ছবির হিরো-হিরোইনদের জানেন তো! গল্পে কেউ বেশি-কম হলে চলবে না। নায়ক-নায়িকার চরিত্র ফিফটি-ফিফটি হলেই ভালো। নায়ক আশি বা নায়িকা কুড়ি বা তার বিপরীত হলে ঝগড়া বেধে যাবে। নায়ক-নায়িকার ব্যতিক্রম কমবেশির মধ্যে ষাট-চল্লিশ পর্যন্ত চলতে পারে, তার বেশি নয়।' খুব মজা পেয়েছিলাম শচীনদার এই বিবৃতিতে, যা কাগজ-কলমে লিখতে গিয়ে অর্ধেক রস নষ্ট হয়ে গেল, তাঁর মুখে শোনার চেয়ে। সাগরদা ৫০ : ৫০ বা ৬০ : ৪০-এর নায়ক-নায়িকাসংবলিত কোনো গল্পের সন্ধান পেয়েছিলেন কি না, জানি না।

আরেকবার প্রমাণ পেয়েছিলাম বাংলাদেশ সম্পর্কে শচীনদার প্রীতির। মুম্বাইয়ে ত্রিশ বছরের অধিক বাস করে কর্মস্থল এখানে হলেও তাঁর মন পড়ে আছে বাংলাদেশে, সেখানকার গান, নদী, সবুজ মাঠ ইত্যাদির মধ্যে। তাঁর সঙ্গে মেলামেশায় বহু নিদর্শন পেয়েছি এসবের।

একদিন শচীনদার আহ্বান পেলাম। যথাসময়ে পৌঁছানোর পর শচীনদা জানালেন, বাংলাদেশ থেকে আমন্ত্রণ এসেছে গান করার। 'তুমি তো

জানো, আমি সভা-সমিতি, জলসা ইত্যাদিতে বিশেষ যাই না। পাবলিকে গান করাও ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু এখানে আমাকে যেতে হবে। দু-চার কথা বলে গানও করতে হবে বলে অনুরোধ এসেছে। আমি এই কথাগুলো বলতে চাই, তুমি ফেয়ার কপি করে দাও।' শচীনদার বক্তব্য ছিল, 'আপনাদের সম্মুখে গান করার এই আমন্ত্রণ আমার কাছে মনে হলো, বাংলা মাটির আমন্ত্রণ, আমার বাংলা মায়ের আমন্ত্রণ।' রবীন্দ্র সরোবরের সেই অনুষ্ঠানে শচীনদা দু-এক মিনিট তাঁর বক্তব্য দিয়ে শ্রোতাদের গানে মাতিয়ে দিয়েছিলেন। শচীনদা ও মীরা বৌদি সাধারণত শীতকালে দু-তিন মাস কলকাতাতে কাটানোর চেষ্টা করেন। শচীনদার কথায়, 'আমি শীতকালে কলকাতায় কাটাতে চাই, সেখানে তখন ভালো মাছ-তরিতরকারি পাওয়া যায়। আর তা ছাড়া সকালে লেকের ধারে একটু বেড়ানো ও একেবারে পুরানো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বসে একটু আড্ডা দেওয়া। বম্বের চিত্রজগতের ব্যস্ততার বাইরে একটু নিরিবিলি দিন কাটাব। এতেই আমার আনন্দ। কিন্তু সে উপায় কোথায়? খবর বেরিয়ে যায় যে আমি কলকাতাতে এসেছি। নানারকম তখন অনুরোধ আসতে থাকে প্রোগ্রাম করার। সকালে লেকে বেড়াতে গেলে ছেলেমেয়েরা চিনে ফেলে। হঠাৎ দেখলাম, কেউ এসে টিপ করে প্রণাম করে কোনো গানের অনুষ্ঠান বা চলচ্চিত্রের গানের কথা জিজ্ঞাসা করে। রটে যায়, আমি এখানে। তখন বাড়িতে শুরু হয় ভিড়। আর আমাকে বম্বেতে পালিয়ে আসতে হয়।'

শচীনদাকে দেখেছি ওই ধরনের কোনো অনুষ্ঠান, জলসা ইত্যাদিতে গান করা খুব পছন্দ করেন না। আমাকে একবার বলেছিলেন, 'নিজেকে কিছুটা দুর্লভ বা rare করতে চাই। তুমি তো জানো, চলচ্চিত্রে একসময় আমি বহু স্থান থেকে, এমনকি নিজের পরিচালনায় যেসব ছবিতে কাজ করেছি, তার প্রযোজক-পরিচালকদের কাছ থেকে গান করার অনুরোধ পেয়েছি বহু। কিন্তু আমি সচরাচর এসব গান করার অনুরোধ উপেক্ষা করেছি। তোমাকে আমি হাতে গুনে বলতে পারব যে, কটা ছবিতে আজ পর্যন্ত কটা গান করেছি নিজের গলায়। যতটুকু স্মরণ আছে, বাংলা ফিল্মে নয়টি গান ও হিন্দি ছবিতে সাতখানা—মোট ষোলোটি গান আমি আজ পর্যন্ত করেছি, চলচ্চিত্রের সহিত প্রায় ২৫ বছর জড়িত থেকে ও এখন পর্যন্ত প্রায় ৮০ খানা ছবির সংগীত রচনা করে।'

শচীনদার কথাতেই তাঁর ফিল্মে গান করার ইতিহাস বলি। 'কলকাতায় কয়েকটি ফিল্মে (যেখানে আমি সংগীত পরিচালনা করিনি) আমার নিজের

রচিত সুরে গান গেয়েছি। সেসব তারিখ এখন আর মনে নেই। তবে একথা বেশ মনে আছে যে, ইংরাজি ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল—এই সাত বছরের মধ্যে নিম্নোক্ত বাংলা ছবিতে আমি নিজে গান করেছিলাম, সেই সব ছবির প্রযোজক বা পরিচালকদের বন্ধুত্বের দাবীতে। আমি একখানা গান করলে ছবির মর্যাদা বা মূল্য বৃদ্ধি হবে বা আমার অনেক বন্ধু এমনও অভিমান দেখাতেন যে আমি যদি অন্তত একটি গান না করি, তাহলে তারা ছবি তোলাই বন্ধ করবেন। আমি তাঁদের এই স্নেহ-প্রীতির দাবি অগ্রাহ্য করতে পারিনি। তবে আমি দুটি শর্ত দিতাম, যাতে তাঁরা সর্বদাই রাজি হয়েছেন। প্রথমটি—আমি যে গান করব, তার সুর আমিই রচনা করব (অন্য কেউ সংগীত পরিচালক হলেও)। দ্বিতীয়টি—সেই গান কোনো প্লে-ব্যাক হবে না অন্য অভিনেতার মাধ্যমে। ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড সংগীতরূপে গানটি থাকবে কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে ফুটিয়ে তোলার জন্য।

'আমি সর্বপ্রথম স্বর্গত শ্রীমধু বসুর *সেলিমা* ছবিতে (১৯৩৫) নিজের সুর রচনায় একটি গান করেছিলাম। কথাগুলি এখন আর মনে নেই। তারপর নাম মনে নেই, আরেকটি বাংলা ছবিতেও বিখ্যাত সেই ভাটিয়ালি গানটি গেয়েছিলাম, "ওরে সুজন নাইয়া—কোন বা কন্যার দেশে যাওরে চাঁদের ডিঙ্গি বাইয়া"।

'বাংলাদেশে সে সময় খুব সম্ভবত *নন্দিনী* নামে একটি ছবি নির্মিত হয়েছিল। আমি কাজীদাকে (কাজী নজরুল ইসলাম) খুব শ্রদ্ধা করতাম। এই একটিমাত্র ছবিতে আমি কাজীদার লেখা গান ও তাঁর সুরে একটি গান করেছিলাম—"চোখ গেল, চোখ গেল, কেন ডাকিস রে—চোখ গেল পাখিরে।" এই গানটি ছাড়া আমি অন্য কারও সুরে কোনো গান চলচ্চিত্রে গাইনি, একমাত্র নিজের রচিত সুর ছাড়া।

'এরপর *অভয়ের বিয়ে* (১৯৪২) নামের একটি বাংলা ছবিতে গান করেছিলাম, নিজের সুরে, হিন্দি গান "আয়ে দিল বেতর উসে ইয়াদ কিয়ে যা"। বম্বে এসে যখন হিন্দি ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা শুরু করলাম, তখন আমার হিন্দি ছবির প্রযোজক ও পরিচালকরা সর্বদাই তাঁদের ছবিতে গান গাইবার অনুরোধ করত। বম্বেতে যে ছয়টি ছবিতে আমি গান গেয়েছি, প্রতিটিই নিজের সঙ্গীত পরিচালনায়।

'১৯৪৬ সালে বম্বেতে ফিল্মিস্তানের *Eight Days* ছবিতে লোকসঙ্গীতের সুরে একটা গান করেছিলাম, যার প্রথম লাইন "উম্মিদ ভরা পনছি থা, খোঁজ রাহা সজনি"। গানটি কে লিখেছিলেন, মনে নেই।

'তারপর ১৯৫৭ সালে স্বর্গত বিমল রায়ের *সুজাতা* ছবিতে ভাটিয়ালি সুরে একটি গান করেছিলাম, যার প্রথম লাইন হলো, "শুন মেরে বন্ধুরে"। গানটি লিখে ছিলেন মজরুহ সুলতানপুরী। বিমল রায়ের অপর ছবি *বন্দিনী*-তে (১৯৬০) আমি লোকসংগীতের সুরে আরেকটি গান করে ছিলাম, "ও মাঝি, মেরে সাজন হ্যায় উসপার"। লেখক শৈলেন্দ্র। তারপর নবকেতনের *গাইড* ছবিতে (১৯৬৩) একটি গান—"উওহা কোন হ্যায় তেরা" শৈলেন্দ্রর লেখা। সম্প্রতি ১৯৬৯ সালে রালহন-এর *তালাশ* ছবিতে একটি গান করেছি—"মেরে দুনিয়া হ্যায় মা তেরে আঁচলমে" সুলতানপুরীর লেখা।'

এর পরও ১৯৬৯ সালে শচীনদা শক্তি সামন্তের *আরাধনা* ও দেব আনন্দের *প্রেম পূজারী* ছবিতেও গান করেছেন।

রেকর্ডে গান করা সম্পর্কে শচীনদার বক্তব্য হলো, 'হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টসের রেকর্ডে আমি প্রথম গান করি। আমার বহু গান রেকর্ড করেছিল এরা এবং সবগুলোই খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এতে বেশির ভাগই ছিল বাংলা গান, কিছু হিন্দি। হিন্দুস্থানে সবসুদ্ধ ৫৫টি রেকর্ড করেছি, যার সংখ্যা হলো ১১০। এর মধ্যে ৯৪টি বাংলা ও ১৬টি হিন্দি গান।

'পরবর্তী সময়ে আমার গান এইচএমভি রেকর্ড করেছে, এখনো করছে। এখানেও বেশির ভাগই বাংলা গান, কিছু হিন্দি। এইচএমভির রেকর্ড সংখ্যা আমার জানা নেই।'

১৯৩২ সাল থেকে শচীনদার গানের সঙ্গে আমি পরিচিত হলেও শচীনদাকে প্রথম দেখি মুম্বাইয়ে ১৯৪৬ সালে মুম্বাইয়ের কুপারেজ ফুটবল খেলার মাঠে, রোভার্স প্রতিযোগিতায়। শচীনদা ১৯৪৪ সালে মুম্বাইয়ে এসে, তখনো কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত নিজের কাজে। কিন্তু যত কাজই থাকুক না কেন, কলকাতার বিভিন্ন ফুটবল দলের কোনো খেলায় শচীনদার অনুপস্থিতি ভাবাও অসম্ভব। সংগীতের পরই বোধ হয় শচীনদার বিশেষ আকর্ষণ খেলাধুলা, প্রধানত ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস। একদিন আমাকে বলেছিলেন, 'আমি পয়লা নম্বরের টেনিস খেলোয়াড় হতে পারতাম, কিন্তু কী করব, গানের গলার জন্য আমার প্রিয় টেনিস খেলা ছাড়তে হলো। খেলা অত অভ্যাস করায় গলা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। তা না হলে কলেজে ছাত্রজীবনে উঠতি চ্যাম্পিয়ন টেনিস খেলোয়াড় ছিলাম।'

শারীরিক অসুস্থতার আগ পর্যন্ত শচীনদাকে সব সময় রোভার্স কাপ বা ক্রিকেট টেস্ট খেলার মাঠে দেখা যেত। কোনো খেলা দেখা বাদ দিতেন না।

শচীনদার নিজের কথায় তাঁর জীবনকাহিনি আপনাদের বলার আগে মীরা বৌদির বিষয়ে দু-চারটি কথা বলতে চাই। শচীনদার সংগীতজীবনের সাফল্যের মূলে মীরা দেবীর প্রেরণা, উৎসাহ, সাহচর্য সম্পূর্ণ বর্তমান। মীরা বৌদি শুধু ভার্যা বা গৃহিণীই নন, একাধারে একই সঙ্গে শচীনদার একান্ত সচিব, ম্যানেজার, গানের রচয়িতা—সবকিছু। বৌদি নিজেও সংগীতজ্ঞ, ভালো গান করেন। একদিন শচীনদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'বৌদি গান করেন না? ওঁর একা আসর বসাতে চাই।' শচীনকর্তা কৌতুকের হাসি দিয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, 'মীরা সংগীতচর্চার আর কোথায় সময় পায়, আমার ইনকাম ট্যাক্সের হিসাব রাখতে রাখতেই ওঁর সময় চলে যায়।' কথাটা খুবই সত্যি। শচীনদা সবকিছু ভুলে গিয়ে একান্ত মনে ত্রিশ বছর যে সংগীত সাধনায় রত, একাগ্রচিত্তে অন্য কোনো কিছু চিন্তা না করে, তা সম্ভব হয়েছে মীরা দেবীর জন্য। শচীনদার অন্য সব গুরুভার মীরা দেবী নিজের ওপর নিয়ে সুষ্ঠুভাবে তা পালন করে যাচ্ছেন। সদা হাস্যময়ী, সংগীতে মশগুল মীরা দেবীও অসাধারণ ও বহু গুণসম্পন্ন। শচীনদা আমাকে বলেছিলেন, 'বোম্বেতে অনেক সময় মুশকিলে পড়ে যাই। গানের কোনো আইডিয়া, কোনো কলি বা কোনো সুর মনে এল, কিন্তু তা থেকে সঙ্গে সঙ্গে যে কেউ গান বেঁধে দেবে, যাতে সুরটাকে ধরে রাখতে পারি, তার অভাব বোধ করতাম।' শ্রীগৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, শ্রীরবি গুহমজুমদার তাঁর প্রিয় লেখক, কলকাতার বাসিন্দা। প্রয়োজনে কাছেপিঠে তাদের কী করে পাবেন। শচীনদা বহু সময় নিজের গানের লাইন বা কলির আইডিয়া দিয়ে দেন গানের রচয়িতাকে। তার ওপর ভিত্তি করে গান লেখা হলে শচীনদা সুর দেন। এ রকম একটি বিখ্যাত গান, গৌরীপ্রসন্নের লেখা, 'বাঁশি শুনে আর কাজ নাই, সে যে ডাকাতিয়া বাঁশি'। ইদানীং মীরা বৌদি শচীনদার জন্য এ ধরনের বেশ কয়েকটি বাংলা গান লিখেছেন, যা শচীনদা পুজো উপলক্ষে রেকর্ড করেছেন।

দাম্পত্য জীবনে এঁদের দুজনের যে সমঝোতা, যে মধুর হাসিখুশি, হিউমার, সংবেদনশীল-সহানুভূতির সম্পর্ক দেখেছি, তার তুলনা মেলা ভার। বহু সময় এঁদের দেখে আমার মনে হয়েছে, 'আইডিয়াল কাপল'। শচীনদা যেমন সবকিছুতে মীরা বৌদির ওপর নির্ভরশীল, তেমনি মীরা বৌদির কর্তাই হলো ধ্যানধারণা। মীরা বৌদি শচীনদাকে ত্রিপুরার রীতি অনুযায়ী 'কর্তা' বলে সম্বোধন করেন এবং কোনো কোনো সময় 'আপনি'ও বলেন। এ প্রসঙ্গে এঁদের দাম্পত্য জীবনের মধুর সম্পর্কের একটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। শান্তিনিকেতনের 'কারুসঙ্ঘ' মুম্বাইয়ের জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারিতে প্রদর্শনী

করছে, তাদের বাটিক শাড়ি, চাদর, কাঁথা ইত্যাদির। বাটিকের গলার চাদর শচীনদার খুব পছন্দ এবং গলার চাদর তিনি সব সময় ব্যবহার করেন। শচীনদা ও মীরা বৌদিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম প্রদর্শনী দেখে চাদর কিনে নিতে। মীরা বৌদি শচীনদার জন্য কয়েকটি চাদর এবং অন্য আরও কিছু কিনলেন। এর মধ্যে শচীনদা একপাশে আমাকে ডেকে নিয়ে প্রদর্শনীতে টাঙানো একটি সুন্দর শাড়ি দেখিয়ে বললেন, 'মীরাকে কিছু বলবে না। ওই শাড়িটা খুলে, ওর অজান্তে আমাকে যাবার সময় দিয়ে দিও। মীরার কাছে এখন দাম চেয়ো না। আমার পকেটে এখন টাকা নেই, আমি তোমাকে পরে দিয়ে দেব। বাড়িতে ফিরে মীরাকে সারপ্রাইজ দিতে চাই।' আমি বললাম, 'ঠিক আছে।' শচীনদা কিন্তু সেদিন আখেরে আর মীরা বৌদিকে সারপ্রাইজ দিতে পারেননি। কারুসঙ্ঘের কর্মীরা শাড়িটা খুলে অসাবধানতাবশত অন্যান্য সব সওদার সঙ্গে মীরা বৌদির সামনেই প্যাক করে দিয়েছিল। মীরা দেবী বললেন, 'শাড়িটা কে নিল?' তখন শচীনদা বাধ্য হয়ে বললেন, 'ওটা আমি দিতে বলেছি। তুমি দামটা তাহলে দিয়েই দাও।' সেদিন শচীনদার মীরা বৌদিকে সারপ্রাইজ দেওয়ার প্রচেষ্টা বানচাল হওয়াতে আমি খুব দুঃখিত হলেও আমরা সবাই খুবই কৌতুকান্বিত ও আনন্দিত হয়েছিলাম।

সলিল ঘোষ

সরগমের নিখাদ

১

আমার গাথা, আমার সুর—এর বেশি আমার নিজের সম্বন্ধে কোনো কথা খুঁজে পাই না। আর বলার কীই বা আছে, নিজেকে কোনো দিন জাহির করতে চাইনি, শুধু চেয়েছি সরগমের নিখাদ হয়ে যাতে থাকতে পারি।

সলিলের স্নেহের আবদারে আজ আবার পিছন ফিরে তাকালাম—পুরোনো দিনগুলোর স্মৃতি যেটুকু স্মরণে আছে, বলছি।

ত্রিপুরা সম্বন্ধে এই প্রবাদ আছে যে সেখানকার রাজবাড়িতে রাজা, রানি, কুমার, কুমারী থেকে দাসদাসী পর্যন্ত সবাই গান গায়। গলায় সুর নেই, গান গাইতে পারে না—এমন কেউ নাকি সেখানে জন্মায় না। ত্রিপুরার ধানের খেতে চাষি গান গাইতে গাইতে চাষ করে; নদীর জলে মাঝিরা গানের টান না দিয়ে নৌকা চালাতে জানে না; জেলেরা গান গেয়ে মাছ ধরে, তাঁতিরা তাঁত বুনতে বুনতে আর মজুরেরা পরিশ্রম করতে করতে গান গায়। সেখানকার লোকেদের গানের গলা ভগবৎ প্রদত্ত। আমি সেই ত্রিপুরার মাটির মানুষ—তাই বোধ হয় আমার জীবনটাও শুধু গান গেয়ে কেটে গেল। সংগীত আমার ফার্স্ট লাভ।

ত্রিপুরার রাজবাড়ির রাজকুমার হয়ে জন্মেছি প্রাচুর্যের যুগে। বিলাস-ব্যসন, ঐশ্বর্য-বৈভব, শৌখিনতা, আদবকায়দা দেখেছি অফুরন্ত আমাদের বাড়িতে। রাজবাড়ির নিয়ম অনুযায়ী জনসাধারণের থেকে আমাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে গুরুজনেরা আমাদের শৈশব থেকেই সচেতন করে দিতেন। তাঁরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন, যাতে আমরা তাঁদের মতে যারা সাধারণ লোক, তাদের

সঙ্গে মেলামেশা না করি। আমি তাঁদের এ আদেশ কোনো দিনও মেনে চলতে পারিনি। কেন জানি না, জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাটির টান অনুভব করে মাটির কোলে থাকতেই ভালোবাসতাম। আর বড় আপন লাগত সেই সহজ-সরল মাটির মানুষগুলোকে, যাদের গুরুজনেরা বলতেন সাধারণ লোক। যা-ই হোক, অসাধারণের দিকে না ঝুঁকে আমি ওই সাধারণ লোকেদের মাঝেই নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে তাদের সঙ্গে এক হয়ে গেলাম শৈশব থেকেই। আমার এই আচরণ ও স্বভাব রাজপরিবারে কেউ পছন্দ করতেন না। আমার বাবারও কিন্তু কোনোপ্রকার Pride বা Prejudice ছিল না। যদিও তিনি ছিলেন 'মহারাজকুমার', ত্রিপুরার অন্যতম মন্ত্রী—মহারাজা স্বর্গত ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের একমাত্র বংশধর।

আমি আমার পিতৃদেবের ধাঁচে গড়া, তাঁর শিক্ষাই আমার মেরুদণ্ড। আমার কাছে বাবা ছিলেন সিদ্ধ মহাপুরুষ। তাঁর দীক্ষাতেই আমার এই সামান্য কলাবিদ্যার স্ফুরণ ঘটেছিল। পাঁচ ভাই আর চার বোনের আমিই ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ। তাই বাবা আমাকে অঢেল ভালোবাসতেন। সত্যিকারের কলাকার ও গুণী শিল্পী ছিলেন তিনি। বাবা খুব নিপুণ হাতে সেতার বাজাতেন, আর তা ছাড়া চমৎকার গলা ছিল তাঁর ধ্রুপদাঙ্গ গানের। ছবি আঁকা আর মূর্তি গড়াতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। আমাদের বাড়ির দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা, কালীপূজা—এসব উৎসবে কুমোরকে সরিয়ে দিয়ে আমার বাবা স্বর্গত মহারাজকুমার শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মন বাহাদুরকে দেখেছি দেবীর মূর্তি গড়তে।

ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় 'কুমার বোর্ডিং' রাজকুমারদের লেখাপড়ার প্রতিষ্ঠান ছিল। কোনো ডিসিপ্লিন ছিল না। মাষ্টারমশাইরা রাজকুমারদের রীতিমতো ভয় করতেন। আমাদের শাসন করা তো দূরের কথা—আমাদের যথেচ্ছাচারই অধ্যাপকেরা সসম্ভ্রমে মেনে নিতেন। আমাদের এই স্বেচ্ছাচারিতা বাবার নজর এড়াল না। তিনি আগরতলার রাজকুমার বোর্ডিং থেকে আমাকে সরিয়ে এনে তাঁর কুমিল্লার বাড়িতে নিজের তত্ত্বাবধানে রাখলেন এবং কুমিল্লার জেলা স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন Class V-এ।

এখানে বলে রাখা ভালো, আমার জন্ম এই কুমিল্লাতেই ইংরাজি ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর। আমার মাতৃদেবী রানি শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক এবং ত্রিপুরার রাজবাড়ির ঘনিষ্ঠ প্রীতির সম্পর্ক ছিল। তিনি আমার বাবার নিকটতম বন্ধুও ছিলেন। কবিগুরু একবার যখন ত্রিপুরা অঞ্চলে ভ্রমণে আসেন, আমাদের বাড়িতে বাবার সঙ্গে কয়েক দিন ছিলেন। বাবা আমার বড় ভাইয়ের (যমজ দুই ভাই

প্রফুল্ল ও প্রশান্ত) শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর শিক্ষামন্দিরে এবং তারপর দার্জিলিংয়ে সেন্ট পলস স্কুলে রেখে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু আমার প্রতি তাঁর স্নেহের আধিক্য এত ছিল যে কখনো তিনি আমাকে কাছছাড়া করতে চাননি। নিজের কাছে রেখে আমার শিক্ষার ভার তিনি নিজেই নিয়েছিলেন। আমার পক্ষে এর ফল ভালোই হলো। তাঁর প্রভাবে, তাঁর বহুমুখী কলাবিদ্যার ও শিল্পের ছাপ আমার মধ্যেও প্রতিফলিত হলো। মার্গসংগীতে আমার প্রথম গুরু আমার বাবা। সন্ধ্যাবেলা আমাদের সব ভাইবোনকে নিয়ে বাবা উপাসনায় বসতেন। তারপর মাঝেমাঝে আমাদের সঙ্গে নিয়ে মার্গসংগীতের আসর জমিয়ে তুলতেন।

যাঁদের সংস্পর্শে আমি সংগীতপ্রেমিক হয়েছি, তাঁদের একজন হলেন ছোড়দা, লেফটেন্যান্ট কর্নেল কুমার কিরণকুমার দেববর্মন। আমার থেকে তিনি ছয় বছরের বড় ছিলেন। ললিতকলায় তাঁর মেজাজ ছিল ভরপুর, কিন্তু বাবার ইচ্ছায় মিলিটারি লাইনে তাঁকে যেতে হলো। তাঁর গলা ছিল অতি মধুর, তিনি খটকি, মুড়কি তান ও লয়ের সঙ্গে গান গাইতেন, ছবি আঁকতেন, মূর্তি গড়তেন। মিলিটারির কাজের অবসরে তিনি এসবের মধ্যেই মগ্ন থাকতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ছোড়দা ত্রিপুরা রাইফেল বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন। যুদ্ধের শেষে দেশে ফিরে এসে গান-বাজনায় আমাকে মাতিয়ে তুলতেন। বাল্যকালে ছুটিতে দার্জিলিংয়ের সেন্ট পলস স্কুল থেকে যখন তিনি দেশে আসতেন, যৌবনে যখন তিনি পাতিয়ালা রাজ্যের প্রতিরক্ষা বাহিনীতে পদাতিক বাহিনীর ক্যাপ্টেন, তখন ছুটিতে দেশে ফিরেই আমার সঙ্গে গান-বাজনা করে, সংগীত সম্বন্ধে নানা রকম আলোচনা করে, মশগুল হয়ে থাকতেন। ভাইবোনদের ভিতর তিনি আমার সবচাইতে প্রিয় ছিলেন এবং তাঁর প্রভাব আমার সংগীতজীবনে প্রচুর। ১৯৪৩ সালে ছোড়দার মৃত্যু আমাকে খুবই আঘাত দেয়।

আমাদের কুমিল্লার বাড়িতেও সর্বদা গানবাজনার রেওয়াজ ছিল। আমার মেজদি কুমারী তিলোত্তমা দেবীও খুব ভালো গাইতেন। পুজো ও হোলির সময় ভারতবর্ষের বিখ্যাত গুণী গায়ক ও যন্ত্রশিল্পীরা আমন্ত্রিত হয়ে আমাদের বাড়িতে আসতেন। আগরতলায় তাঁরা এসে বেশ কিছু দিন থেকে যেতেন আর দিনরাত তাঁদের সংগীতে আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকতাম। কুমিল্লায় ও আগরতলায় তাঁদের সান্নিধ্যে মার্গসংগীতে আমার কান স্কুলের জীবন থেকেই তৈরি হতে লাগল। পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রজীবনে বাবার শেখানো গান আমি সরস্বতীপূজায় আমাদের স্কুলের অনুষ্ঠানে গেয়েছি। এই আমার কোনো অনুষ্ঠানে প্রথম গান

গাওয়া, সেটা ছিল ইংরাজি ১৯১৫ সাল। এই গানের পর সহপাঠীদের মধ্যে আমার জনপ্রিয়তা খুব বেড়ে গেল, একেবারে যেন হিরো হয়ে গেলাম। হেড মাষ্টারমশাই আমার খুব তারিফ করে বাবাকে চিঠিই লিখে ফেললেন।

কুমিল্লায় তখন শ্রীশ্যামাচরণ দত্ত নামে ধ্রুপদ ও খেয়াল গায়কের খুব নাম ও প্রতিষ্ঠা ছিল। তিনি অনেক বাড়িতে গান শেখাতেন। পশ্চিম অঞ্চলের গায়কদের মার্গসংগীতের স্টাইল এত আমার ভালো লাগত যে, শ্যামাচরণবাবুর আমাকে গান শেখানোর ইচ্ছা সত্ত্বেও আমি তাঁর কাছে গান শিখতে নারাজ হলাম। বাবাই আমাকে গান শেখাতে লাগলেন।

মার্গসংগীতের সঙ্গে সঙ্গে আমার মন গ্রাম্যসংগীতের দিকে ঝুঁকে গেল। মাধব নামের আমাদের এক বৃদ্ধ চাকর ছিল। রোববার স্কুল ছুটির দিনে খাওয়াদাওয়ার পর দুপুরে এই মাধব আমাদের সুর করে রামায়ণ পড়ে শোনাত। সে যখন সুরে রামায়ণ পড়ত, তখন তার তান খটকি ছাড়া সরল-সোজা গানের ধরন আমাক পাগল করে দিত। কোনো ওস্তাদি নেই, কিন্তু কত অনায়াসে সে গেয়ে যেত। আমাদের বাড়িতে বাউল, ভাটিয়ালি গাইয়ে, গাজন-গান ও কালীনাচের গাইয়ে, ফকির, বোষ্টম দূরের গ্রাম থেকে সর্বদাই আসত। তাদের গানে আমি অভিভূত হয়ে যেতাম। আমাদের বাড়িতে আনোয়ার নামের আরেক ভৃত্য ছিল। এই আনোয়ার ছিল আমার মাছ ধরা শেখানোর গুরু। আমাদের বাগানের বাঁশ গাছের বাঁশ কেটে তাই দিয়ে নিজের হাতে ছিপ তৈরি করে, নিজে সুতো কেটে তা ছিপে জুড়ে দিত। ওর নিজস্ব সম্পত্তির এক বাক্স খুলে তা থেকে ওর নিজের মরচে পড়া বড়শি ছিপে লাগিয়ে আনোয়ার আমাকে মাছ ধরা শেখানোর হাতে খড়ি দিল। কুমিল্লায় আমাদের ষাট বিঘা জমির ওপর বাড়ি। তাতে ফলের, তরকারির, ফুলের বাগান, বড় বড় পুরোনো গাছ, আর তিনটে বড় পুকুরে ভর্তি মাছ ছিল। এসব বাবার শখের জিনিস। বাবা নিজের হাতে গাছ লাগাতেন। মালীর সঙ্গে বাবা নিজের হাতে মাটি কোপাতেন। গোমতী নদী থেকে নিজে মাছের পোনা সংগ্রহ করে প্রতিবছর পুকুরে ছাড়তেন। আনোয়ার ও আমি সুযোগ বুঝে ছিপ নিয়ে বসে যেতাম; আর দুজনে মাছ ধরতাম। তারপর গান গাইতে গাইতে পুকুরের ধারে ধারে ও বাগানে দুজনে বেড়িয়ে মনের কথা বলতাম। সেই দিনগুলো যে কী মধুর ছিল, তা এখন বলে বোঝাতে পারব না।

আনোয়ার রাত্রে তার দোতারা বাজিয়ে যখন ভাটিয়ালি গান করত, তখন আমার ব্যাকরণ মুখস্থ করার দফারফা হয়ে যেত এবং পরদিন স্কুলে মাষ্টারমশাইয়ের কাছে বকুনিও খেতাম। কিন্তু রাতে আবার ব্যাকরণ মুখস্থ, অঙ্ক কষা ছেড়ে আনোয়ারের কোল ঘেঁষে বসে তার ভাটিয়ালির সুরে ও কথায় নিজেকে

হারিয়ে ফেলতাম। এরাই হলো লোকসংগীতে আমার প্রথম দুই গুরু—মাধব ও আনোয়ার। ওস্তাদি গানে গলা সাধতে হয় দস্তুরমতো, তাতে সরগম, তাল-লয়-মিড়-গমকের দরকার। কিন্তু আনোয়ারের গানে এসবের কোনো বালাই ছিল না, সহজ সুরে মিষ্টি করে গেয়ে সে প্রাণ মাতিয়ে দিত। আমি মার্গসংগীত যত পছন্দ করতাম, ঠিক ততখানি মাধব ও আনোয়ারের গানেও মুগ্ধ হতাম।

স্কুলের সঙ্গেই লাগোয়া খেলার মাঠ ও তার পাশে বুড়ো বটগাছ। সেই গাছের নিচে আমাদের গানের নিয়মিত আসর জমত টিফিনের ছুটিতে। আমি আনোয়ারের গানগুলো গাইতাম, খোলা মাঠে, পাশে ধর্মসাগর দীঘি। বড় বড় গাছের তলায় রোদে, বৃষ্টিতে, ঝড়ে-বাদলে, শীতে, কী আনন্দই না পেয়েছি প্রকৃতির কোলে মাটির গান গেয়ে দিন কাটিয়ে। সে আনন্দের আস্বাদন আজ আর পাওয়া যাবে না। শহরবাসী তার মূল্য বুঝবে না, সন্ধানও পাবে না। আনোয়ারের গান সোজা-সরল সুরে ও কথায় দেহতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, রাধাকৃষ্ণের মিলন-বিরহের বর্ণনা কী যে অপূর্ব আমেজ এনে দিত, তা বুঝিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব নয়! এই গানগুলোর সহায়তায় আমার ও আমার বন্ধুদের মহাবিপদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার ঘটনা এবার বলছি।

আমি যখন নবম শ্রেণীতে পড়ি, কুমিল্লা থেকে দশ মাইল দূরে কমলাসাগরে পুজোর মেলা দেখতে যাচ্ছি বন্ধুবান্ধব ও সহপাঠীদের সঙ্গে। সেখানে কালীমন্দিরের চারিপাশ ঘিরে মেলা বসত। বহু দূর থেকে গ্রামবাসী মেলা দেখতে আসত। মেলা দেখা শেষ করে কমলাসাগর স্টেশনে এসে দেখি, ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে। আমরা টিকিট না কেটেই দৌড়ে ট্রেনে উঠে পড়ি। পরে টিকিট চেকারের হাতে ধরা পড়ে যাই, বিনা টিকিটে ভ্রমণের অপরাধে। কুমিল্লার স্টেশন মাস্টার আমাদের সবাইকে স্টেশনের পাশে একটা গুদামঘরে বন্ধ করে দেন। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় বাবার অনুমতি নিইনি, ভেবেছিলাম সন্ধ্যার আগেই বাড়ি ফিরে যাব, কোনো জবাবদিহি করতে হবে না। এখন স্টেশনে গুদামজাত হয়ে আমি তো কেঁদেই ফেলি। আমার সহপাঠী মোহিত এক বুদ্ধি জোগাল। সে বলল, 'স্টেশন মাস্টারের মা খুব গান ভালোবাসেন। কিছু আগে আমাদের বাড়িতে ঢপ কীর্তন শুনতে এসে আবেগে কাঁদছিলেন। শচীন, তুই তোর ভাটিয়ালি ও বাউল গানগুলো শুরু কর দেখি। এই গানগুলো গাইলে আমাদের মুক্তি পাওয়ার একটা সুরাহা হবে।' আমি অবসন্ন মনে গান শুরু করে দিলাম। গানে কোনো প্রাণ ছিল না। কারণ, আমি তখন বাড়ি পৌঁছাতে পারলেই বাঁচি। কিন্তু গানের কী মহিমা আর মোহিতের বুদ্ধির কী বাহাদুরি—আমার গান পৌঁছাল স্টেশন মাস্টারের মার কানে। দশ

মিনিটের মধ্যে তাজ্জব ব্যাপার! গুদামঘরের দরজা খুলে গেল। দেখি, সশরীরে স্টেশনমাস্টারের মা উপস্থিত। গান শোনার পর ছেলের নিকট আমাদের কথা শুনে মুক্তি দিলেন আমাদের। এমনকি বাড়ি যাওয়ার আগে সবাইকে মিষ্টি মুখও করিয়ে দিয়েছিলেন।

স্কুলের ছাত্রজীবন বড় আনন্দের ভেতর দিয়ে কেটে গেল। ব্যাকরণ ও অঙ্কের নামে আমার গায়ে জ্বর এসে যেত। তবুও কী করে জানি না, ১৯২০ সালে ১৪ বছর বয়সে কুমিল্লা জেলা থেকে ম্যাট্রিক পাস করে ফেললাম। ১৯২১ সালে বাবা আমাকে কুমিল্লায় ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি করিয়ে দিলেন। আইএ-তে আর্টসের ছাত্র হলাম। পড়ায় তেমন মন ছিল না। পাশের নবাববাড়িতে প্রতিবছর বড় বড় গাইয়ে, বাজিয়ে ও বাঈজিরা এসে গান-বাজনা করতেন। পড়া ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে রাত জেগে সেসব মজলিসে সময়মতো উপস্থিত হতাম, আর রাতের পর রাত তাদের গান-বাজনা উপভোগ করতাম। তা ছাড়া কুমিল্লা ও আগরতলার চারপাশের গ্রামে গ্রামে ঘুরে ভাটিয়ালি ও বাউল গায়কদের সঙ্গলাভে বেড়াতাম কলেজ ফাঁকি দিয়ে। এসব গায়কের গানে গ্রামের আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে থাকত। অবসর সময় আনোয়ারের সঙ্গে মাছ ধরে বেড়াতাম। এই মাছ ধরার নেশা পরবর্তী কালেও কলকাতাতে আমার ছিল। প্রায়ই বন্ধুবান্ধবসহ কলকাতার আশেপাশে গ্রামের পুকুরে মাছ ধরতে যেতাম। বম্বে এসেও 'পাওয়াই হ্রদের' মাছ ধরার ক্লাবের সভ্য হয়ে মাছ ধরতে গেছি। শ্রীনীতিন বসুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমুকুল বসু, প্রযোজক শ্রীগুরু দত্ত ও আরও অনেকে আমার সঙ্গী হতেন। এই মাছ ধরা আমার একটি অবসর বিনোদনের উপায় ছিল। এ ছাড়া ছিল টেনিস খেলার নেশা। কুমিল্লায় আমাদের বাড়িতে টেনিস লন ছিল, সেখানে সর্বদাই খেলতাম। সেখানে টেনিস চ্যাম্পিয়ন আখ্যাও পেয়ে গিয়েছিলাম। ম্যাট্রিক পর্যন্ত বাবা আমায় বাইরে থাকার সময় নির্দেশ করে দিতেন। কিন্তু কলেজে ওঠার পর, আমার গানের তৃষ্ণা মেটাতে যখনই বাইরে গ্রামে ঘুরে বেড়াতাম, তখন বাবা আর কোনো কৈফিয়ত চাইতেন না। বরঞ্চ উৎসাহ দিতেন। শুধু একটি কথাই বলে দিতেন, 'সময়মতো খাওয়াদাওয়া করবে, আর পাস করতেই হবে একবারে—কাজেই পড়াশোনার সময়টুকু ঠিক রেখো। তোমার গান শেখার বা শোনার ইচ্ছায় আমি কোনো বাধা দেব না। কারণ নিজের ভালোমন্দ বোঝার তোমার এখন বয়স হয়েছে।' ব্যস, এর বাইরে আর কোনো শাসন বা আদেশ আমার ওপর ছিল না।

২

আমাদের প্রত্যেক ভাইবোনের জন্য আলাদা আলাদা ধাইমা ছিলেন। জন্মাবধি প্রাণ ঢেলে, স্নেহ দিয়ে আমাদের তাঁরা লালনপালন করেছেন। আমার বৃদ্ধা ধাইমার নাম ছিল 'রবির মা', নিজের ছেলের পরিচয়ে। আমি অবশ্য 'ধাইমা' বলেই ডাকতাম। তিনি জন্মাবধি আমাকে সেবা-যত্ন-স্নেহ দিয়ে বড় করেছিলেন। তিনি রবির মা, না আমার মা, তা কেউ পৃথক করে বলতে পারত না। ছেলেবেলায় আমার রং খুব ফরসা ছিল বলে ধাইমা আমাকে বলতেন 'ডালিমকুমার'। চব্বিশ ঘণ্টা তিনি আমাকে স্নেহের আঁচলে ঢেকে রাখতেন, জ্ঞান অবধি তাঁর হাতেই স্নান-খাওয়া-শোওয়া—সবকিছু। কলেজজীবনেও বাড়ি থেকে যখন বাইরে যেতাম, আমার পথ চেয়ে বসে থাকতেন তিনি। দেরি হলে তাঁর বকুনি শুনতে হতো। পরে যখন ১৯২৫ সালে আমি কলকাতায় স্থায়ীভাবে এসে বাস করছি, ধাইমাও আমার সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলেন। কারণ, আমাকে না দেখে তিনি থাকতে পারতেন না। দুই বছর আমার সঙ্গে থেকে ১৯২৭ সালে দেশে ফিরে গেলেন। বৃদ্ধা ধাইমা দেশে ফিরেই রোগে আক্রান্ত হন এবং অল্প কয়েক দিন ভুগে ইহলোক ত্যাগ করেন। শেষ সময় আমার সঙ্গে তাঁর আর দেখা হয়নি, আমি তখন কলকাতায়।

১৯২২ সালে আইএ পাস করলাম। দাদারা সবাই বিদেশে থেকে লেখাপড়া করেন। আমিও এবার কলকাতায় গিয়ে লেখাপড়া করব, এ কথা বাবাকে বললাম। আসল কথা, কলকাতায় গিয়ে গান শেখার ইচ্ছাটাই তখন আমার প্রবল হয়ে উঠেছিল। বাবা আমাকে কাছছাড়া করতে রাজি হলেন না—'তুমি আমার ছোট ছেলে, অন্য সবাই বিদেশে, অন্তত আরও দুটি বছর তুমি আমার কাছেই থাকবে, এটাই আমি চাই।' বাবার মুখ চেয়ে কুমিল্লাতেই থেকে গেলাম

আর ১৯২৩ সালে বিএ ক্লাসে ভর্তি হলাম, ভিক্টোরিয়া কলেজে। পূর্ববঙ্গের গ্রাম-আকাশ-বাতাস বোধ হয় আমাকে ছাড়তে চাইল না। প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে থাকার আরও অবকাশ পেলাম। আমার পক্ষে একদিক দিয়ে ভালোই হলো।

বিএ পড়া আরম্ভ হলো। কৈশোর পেরিয়ে এবার যৌবনে পদার্পণ করছি, তা উপলব্ধি করলাম। নতুন উদ্দীপনায় ঘুরে বেড়াতাম গ্রামে-মাঠে-ঘাটে। ভাসাতাম নদীর জলে নৌকা, চাষি, জেলেদের সঙ্গে—বাউল, বোষ্টম, ভাটিয়ালি গায়ক ও গাজন দলের সঙ্গে ছুটির ফাঁকে কলেজ ফাঁকি দিয়ে সময় কাটাতাম গান গেয়ে, শিখে, শুনে আর তামাক খেয়ে। আমরা সবাই যে এক হুঁকোয় তামাক খেতাম, বাবা তা জানতেন না।

পূর্ববঙ্গের এই অঞ্চলের এমন কোনো গ্রাম নেই বা এমন কোনো নদী নেই, যেখানে আমি না ঘুরেছি। ছুটি ও পড়াশোনার ফাঁকে আমি গান সংগ্রহ করতাম। আমার এখনকার যা কিছু সংগ্রহ, যা কিছু পুঁজি, সে সবই ওই সময়কার সংগ্রহেরই সম্পদ। আজ আমি শুধু ওই একটি সম্পদেই সমৃদ্ধ, যে সম্পদের আস্বাদন করে আমার মনপ্রাণ এখনো ভরে ওঠে; যে সম্পদের জোরে আমি সুরের সেবা করে চলেছি, তার আদি হলো আমার ওসব দিনের সংগ্রহ ও স্মৃতি।

সব রকম সুরই আমি রচনা করেছি; কিন্তু লোকসংগীতে আমার আত্মা যেন প্রাণ পায়। আমি যে মাটির মানুষের সঙ্গে, তাদের সান্নিধ্যে প্রকাশিত হয়েছি, তাই তাদের সহজ-সরল গ্রাম্য সুর আমার গলায় সহজে ফুটে ওঠে। সে সুরই আমার কল্পনার রাজ্য, আপনা থেকেই তা জাগে, গলায় আপনা থেকেই তা বেজে ওঠে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা গলায় এসে যায়। এর জন্য কোনো রেওয়াজের প্রয়োজন হয় না—এ সুর নিজের জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে। আমার মধ্যে রাজবাড়ির নিয়মকানুন, আদবকায়দা বা ফরমালিটিজ কেউ খুঁজে পেত না। যে গ্রামের খোলা মাঠের সবুজ আমেজ পেয়েছে, যাকে বড় বড় প্রাচীন গাছগুলি ছায়ার আড়াল করে প্রকৃতির মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে, যে না জানি কিসের আকর্ষণে রাত্রেও গ্রামে গ্রামে কাটিয়েছে, যেখানে দু-একটা কেরোসিনের পিদিম টিম টিম করে—সেই পরিবেশে যে নীল আকাশকে ভালোবেসেছে, যে গ্রামের সরল লোকেদের সঙ্গে মাটিতে বসে মশগুল হয়ে গেছে, তাকে রাজবাড়ির আবহাওয়া বাঁধবে কী করে?

হিন্দিতে এক প্রবন্ধ আছে 'রাগ, রসুই, পাগড়ি—কভি কভি বন যায়' (মানে গান-বাজনা, ভালো রান্না ও মাথায় ভালো পাগড়ি বাঁধা সব সময় সম্ভব নয়, কখনো কখনো তা হয়।) লোকসংগীতে এই প্রবাদ কিন্তু অচল। গ্রামের পরিবেশে বাউল বা ভাটিয়ালি সব সময়ই জমে যায়।

কলেজজীবনে প্রতিবছরই আমাদের নাটক হতো। এসব নাট্যাভিনয়ে আমি হতাম সংগীত পরিচালক। যত দূর মনে পড়ে, আমাদের ইতিহাসের অধ্যাপক হতেন নাট্য পরিচালক। তিনি নিজে গান লিখতেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে সুর বসিয়ে দিতাম। কলেজের ছাত্রমহলে আমার তখন জয়-জয়কার।

১৯২৪ সালে বিএ পাস করলাম। বাবা আমাকে কলকাতায় নিয়ে এসে ১৯২৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দিলেন এমএ পড়ার জন্য। আমি কলকাতায় বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে 'ত্রিপুরা প্যালেসে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষায় এমএ পড়তে শুরু করলাম। আমার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের পরিবর্তনে প্রথম দিকে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিলাম না। ইংরেজ আমলের জমকালো চমকপ্রদ কলকাতা শহর ঝলমল করতে লাগল আমার চোখে। দেখে অবাক হলাম। নিজেকে বোকা বলেও মনে হলো শহরে এসে। মানুষের হাতের তৈরি সবকিছু আমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হলো। সিমেন্ট ও পাথরে তৈরি কলকাতায় ছিল ঢালা প্রশস্ত রাস্তাঘাট, বিজলি বাতির রোশনাই—প্রথমটা এসব দেখে কেমন যেন কৃত্রিম মনে হয়েছিল সবকিছু, হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। আরও অবাক হয়েছিলাম এই দেখে যে কলকাতায় মাটি বিক্রি হয়। আমি যে মাটির মানুষ, সেই মাটি কলকাতা শহরে বিক্রি করা হয় এবং তা লোকেও কেনে—এসব দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। সমস্ত দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে কেটে যেত। বাড়ি ফিরেই আকাশ দেখতে ইচ্ছা হতো। এত আলোর ঝলকে আকাশ যেন ম্লান হয়ে লুকিয়ে যেত। কবেই বা পূর্ণিমা, কবেই বা অমাবস্যা বিজলি বাতির কৃত্রিমতায়, তা বুঝতে পারতাম না।

কলকাতার এই পরিবেশে, সব সময় মনে পড়ত দেশের পুরোনো দিনগুলো। আমাদের বাড়ির তিন-তিনটে দীঘির ধারে গান গেয়ে বেড়ানো আর বাঁশি বাজানো। ত্রিপুরায় সবাই বাঁশি বাজাতে পারে, এটাও একটা প্রবাদ। আমাদের দেশের বিশিষ্ট 'টিপরাই বাঁশি', আমিও জ্ঞান হওয়া অবধি বাজাতাম। গোড়ার দিকে এসব স্মৃতি আমার মনে বাধা জাগত। এসব স্মৃতি নিয়েই ঘুমিয়ে পড়তাম। সকালে আবার যন্ত্রচালিতের মতো যন্ত্রের মানুষ হয়ে শহর কলকাতায় দিনের কাজকর্ম আরম্ভ করতাম।

কুমিল্লায় কলেজে পাঠ্যাবস্থাতেই কলকাতা এসে হিন্দুস্থানি সংগীতের বড় বড় ওস্তাদদের কাছে গান শোনা, তাঁদের কাছে গান শেখা, আমার মনে প্রবলভাবে জেগেছিল। এমএ পড়তে আর ভালো লাগে না। এক বছর বাদে ছেড়েই দিলাম পড়াশোনা। ১৯২৫ সালে আমি অন্ধ গায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দের

নিকট হিন্দুস্থানি উচ্চসংগীত শেখা আরম্ভ করলাম। বাবার অনুমতি ছিল। কেষ্টবাবু আমাকে তাঁর প্রিয় শিষ্য করে নিলেন ও খুব যত্ন করে শেখাতে লাগলেন। কুমিল্লার টেনিস খেলার নেশাও ছাড়লাম না। চৌরঙ্গী ওয়াইএমসিএর সভ্য হয়ে নিয়মিত টেনিস খেলতাম। তখন ওয়াইএমসিএতে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের প্রাধান্য লক্ষ করেছিলাম। গোড়ায় তারা আমাকে খেলোয়াড় হিসেবে পাত্তাই দিত না। একদিন সেখানে এক দক্ষিণ ভারতীয় 'মার্কার'-এর সঙ্গে পরিচয় হলো। তারই পরামর্শে প্রত্যেক দিন দুপুর দুটোর সময় মাঠে এসে তার সঙ্গে নিয়মিত অভ্যাস শুরু করলাম। তাকে রোজ আট আনা করে দিতে হতো এবং সে আমাকে এক ঘন্টা অভ্যাস করার সুযোগ দিত। এতে আমার খেলার খুব উন্নতি হলো। ফলে সব সভ্যই পরে আমার সঙ্গে খেলতে চাইত। এরপর আমি সাউথ ক্লাবের সভ্য হলাম। এত বেশি খেলতাম যে খেলার পর আমার গলা বসে যেত, গলা কর্কশ হয়ে যেত। সন্ধ্যার পর গানের রেওয়াজ করতে গিয়ে দেখতাম, আমার গলা বেশ ধরে গেছে। আমার গলার যেন ক্ষতি না হয়, সেদিকে কেষ্টবাবুর খুব লক্ষ ছিল। তিনি আমার গলা ধরার কারণ ধরে দিলেন। বললেন টেনিস খেলা বন্ধ করতে। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী সঙ্গে সঙ্গে টেনিস খেলা ছেড়ে দিলাম। তারপর প্রায় দুই সপ্তাহের মধ্যেই আমি স্বাভাবিক স্বর ফিরে পেলাম। কেষ্টবাবু আমার গলার স্বর বাঁচিয়ে রাখলেন। কেষ্ট বাবুর গান শেখানোর পদ্ধতি ছিল অতি সুন্দর। তিনি তাঁর বন্ধুদের কাছে বলতেন যে ভবিষ্যতে আমার গানে উন্নতি অনিবার্য। রেওয়াজ ছিল অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু কখনো অত্যধিক কিছু করা কেষ্টবাবু অপছন্দ করতেন এবং আমাকেও তা করতে মানা করতেন।

বাবা দুঃখ পেয়েছিলেন এমএ পড়া ছেড়ে দিলাম বলে। এরপর বাবা একবার কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি তখন আমাকে জোর করে 'ল' কলেজে ভর্তি করিয়ে দিয়ে আগরতলায় ফিরে গেলেন। আইনের মারপ্যাঁচ আমি কী পড়ব, ওসব বই দেখলেই আমার মাথা ঝিমঝিম করত। মাথায় আইনের কিছুই ঢুকত না। অল্প কয়েক মাস পর আইন অধ্যয়ন ত্যাগ করলাম। এবার বাবা আমাকে বিলেতে পাঠিয়ে স্টেটের কাজকর্ম প্রশাসন শেখাবার জন্য তৈরি করতে চাইলেন। বাবা তখন ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রী। আমার জন্য রাজ্য সরকারে বড় পদ তিনি ঠিক করে রাখলেন। তখন আমার মনে কী প্রচণ্ড দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল, তা বলা যায় না। বাবাকে ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি। একদিকে তাঁর ইচ্ছাপূরণ, অন্যদিকে যা আমার দ্বারা কখনো সম্ভব নয়। কিন্তু যা-ই হোক, বাবা শেষ পর্যন্ত আমার ইচ্ছেই মেনে নিলেন। বিলেতেও গেলাম না, রাজ্য সরকারে

চাকরিও নিলাম না। কলকাতায় কেষ্টবাবুর কাছে এবং পরে তাঁর অনুমতি নিয়ে তাঁর গুরু ওস্তাদ বাদল খাঁ সাহেবের কাছে গান শিখতে লাগলাম। ওস্তাদ বাদল খাঁর বয়স তখন প্রায় ৯০ বছর। ওই বয়সে প্রিয় ছাত্রদের গৃহে তাঁকে হেঁটে আসতে দেখেছি। ছিপছিপে অথচ বেতের মতো ঋজু শক্ত শরীর ছিল তাঁর। এই সময়ে বলতে গেলে কলকাতায় প্রায় সব গায়কই বাদল খাঁর শিষ্য ছিলেন; যেমন কৃষ্ণচন্দ্র দে, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে। কেষ্টবাবুর সব জলসাতেই আমি উপস্থিত থাকতাম তাঁর সঙ্গে। এ ছাড়া তিনি যখন বড় বড় উচ্চসংগীতের গায়ক, বাদক ও বাঈজিদের গান শুনতে যেতেন, তাঁর সঙ্গে সেসব আসরে মাইফেলে আমাকেও নিয়ে যেতেন।

কলতায় তখন ছিলেন শ্রীশ্যামলাল ক্ষেত্রী, বিখ্যাত হারমোনিয়াম বাদক ও ঠুমরির বিশেষজ্ঞ। আমি তাঁর কাছে বেনারসি ঠুমরি শেখার ও ঠুমরির বোল বানানোর পদ্ধতি শিখেছিলাম। তখন আমার ক্লাসিক্যাল গান শেখার ইচ্ছা প্রবল। গান-বাজনার প্রতি আমার এত শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা দেখে আমি শ্যামলালজির স্নেহের পাত্র হলাম। কলকাতার বাইরের শ্রেষ্ঠ সব সংগীতশিল্পীরা শ্যামলালজিকে এত শ্রদ্ধা করতেন যে শ্যামলালজি যদি কখনো তাঁদের কোনো জলসায় আহ্বান করতেন, তবে তাঁরা সবাই তাতে যোগ দিতেন। তাঁর নিজের গৃহেও এসব ওস্তাদ সংগীতশিল্পীদের গানের আসর লেগেই থাকত। আমার সৌভাগ্য যে শ্যামলালজির গৃহে গানের আসরে আমি সর্বদাই উপস্থিত থেকে শ্রেষ্ঠ সব কণ্ঠশিল্পী, যন্ত্রশিল্পী, বাঈজির গান বহুবার শুনেছি। সেখানেই কোনো এক গানের আসরে সংগীত-জ্ঞানী শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। ব্যস, ধূর্জটিবাবু সেই যে আমাকে ভালোবেসে ফেললেন, তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর সেই ভালোবাসা আমাকে ধন্য করেছে। তিনি ছিলেন লক্ষ্ণৌতে অধ্যাপক; ভারতীয় সংগীতের বিদগ্ধ রসিক ও সমঝদার। তিনি যখনই কলকাতায় আসতেন, আমাদের দেখা হতো, আমাকে সংগীতসাধনায় উৎসাহ দিতেন। ধূর্জটিদা ছিলেন আমার জীবনে সংগীতসাধনায় উৎসাহদাতাদের অন্যতম। ১৯৩৭ সালে কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের গান শুনেছেন, তবুও জানি না, কেন আমার মতো এই ক্ষুদ্র শিল্পীর গান শুনতে তিনি খুব ভালোবাসতেন। আমিও তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতাম। তিনিই আমাকে শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেনের কাছে নিয়ে যান। আমার গান শুনে অতুলপ্রসাদও খুশি হয়ে নানা উৎসাহ দেন।

গিরিজাবাবুর সঙ্গেও শ্যামলালজির বাড়িতেই আমার প্রথম পরিচয়। তিনি তখন কলকাতার স্থানীয় গায়কদের মধ্যে সবচাইতে খ্যাত। তাঁর গানও আমি

বহুবার শুনেছি। এই সময়ে চলচ্চিত্র প্রচারবিদ শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যালের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, যা পরে বন্ধুত্বে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে সুধীরেন্দ্র নিউ থিয়েটারসে প্রচার সচিবরূপে যোগ দেন। তিনিও লেখক, সংগীতপ্রেমী, সুরসিক ছিলেন। আমি এই সময় নিজে গানের সুর-রচনা আরম্ভ করি এবং সুধীরেন্দ্র কয়েকটি গান সে সময় লিখে দেন। তাঁর বাড়ির বৈঠকি আড্ডায় আমি সর্বদাই উপস্থিত থাকতাম। তিনিও আমার কাছে সদাসর্বদা আসতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার গান শুনতেন। কলকাতায় থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে আমার এভাবে যোগাযোগ ছিল। আমি বম্বে চলে আসার পর, এখানে ১৯৫০ সালে আমার সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা। তিনি আমার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। আমাদের দুজনের মধ্যে অত্যন্ত মধুর সম্পর্ক ছিল। আমার গানেরও তিনি ছিলেন একজন দরদি। আমি কখনো তাঁকে ভুলতে পারব না।

আরেকজন সাহিত্যিক, গীতিকার, সংগীতরসিক *নাচঘর* সাপ্তাহিকের সম্পাদক শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের সঙ্গেও এ সময় আমার পরিচয় হয়। ১৯২৫ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে, হেমেন রায়, সুধীরেন্দ্র ও ধূর্জটিদার নিকট সংগীতসাধনায় যে উৎসাহ পেয়েছি, তা বলে বোঝানো মুশকিল। তাঁদের এই উৎসাহ ও সমর্থন না পেলে হয়তো আমি আর এগোতে পারতাম না। তাঁদের প্রেরণায় আমি পুরোপুরিভাবে সংগীতসাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করলাম।

কলকাতায় সে যুগে এমন কোনো গানের জলসা বা সংগীতের আসর ছিল না, যাতে আমি অনুপস্থিত ছিলাম। ভারতের সেরা সেরা সংগীতশিল্পীদেরই কলানৈপুণ্য আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সারা রাত জেগে এসব আসরে গান শুনেছি। সে একটা বিরাট শিক্ষা। সংগীতশিক্ষায় উপযুক্ত গুরু ও অভ্যাসের যেমন প্রয়োজন, তেমনি সংগীত শুনে কান তৈরি করাও আরেক প্রয়োজন। এভাবে অবিশ্রান্ত সংগীতের আসরে গান শুনে আমার যে কান তৈরি হলো, তার গুরুত্বও প্রচুর। এই জন্যই বোধ হয় এখন আমি আমার নিজস্ব গায়কি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছি। শিক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে, এইভাবে ভালো সংগীত শুনে আমার সেই শিক্ষা পাকা হয়েছিল বলেই আমার ধারণা ও আমার জীবনের অভিজ্ঞতা। এইভাবে ক্রমশ কলকাতার বাস্তবধর্মী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম সংগীতকলার প্রেমিক হয়ে।

কলকাতায় 'Indian State Broadcasiting Co.' তখন নতুন। এরপর All India Radio-এর সৃষ্টি। এই ব্রডকাসটিং কোং ডেকে পাঠাল আমাকে গান গাইতে। আমার গান বেতারে প্রচারিত হবে, সে কী কম কথা! খুব উত্তেজনা

মনে। প্রথম যেদিন গান করলাম, সেদিনের সে যে কী আনন্দ, আজও ভুলিনি। শ্রীনৃপেন মজুমদার, শ্রীরাইচাঁদ বড়াল—এঁরা সব তখন কোং-এর কর্তা। আমাকে ১৫ মিনিট গাইবার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। আমার নিজের সুর-সংযোজনায় দুখানা গান গাইলাম। পারিশ্রমিক পেলাম দশ টাকা। এই আমার জীবনের প্রথম উপার্জন। এই দশ টাকা পারিশ্রমিক পাওয়ার তখনকার সেই আনন্দও জীবনে ভোলার নয়। এ আমার কাছে লাখ টাকার থেকেও বেশি মনে হয়েছিল। জীবনে প্রথম আমার নিজের সুর রচনায় গান বেতারে প্রচারিত হলো, পারিশ্রমিক পেলাম দশ টাকা। আমার প্রথম উপার্জন, আমার মনে বিরাট একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তখন। নৃপেনবাবু আমার গানের প্রশংসা করেছিলেন খুব।

১৯২৫ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত কলকাতায় আমি বসবাস করলেও বছরে তিনবার করে আমি দেশের টানে কুমিল্লা ও আগরতলায় গিয়ে বাবা-মা, ভাইবোনদের, প্রিয়জনদের সঙ্গে কাটিয়ে আসতাম। কী যে ভালো লাগত কলকাতা থেকে এভাবে দেশে যেতে! এ সময় আমি গ্রামে ঘুরে গান সংগ্রহ করতাম, সেখানেই সুর রচনাও করতাম। শিকার করাও ছিল আমার এক বাতিক ছেলেবেলা থেকেই। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কোনো কোনো সময় শিকারেও যেতাম। কুমিল্লায় যখন যেতাম, তখন আমার পুরোনো পরিচিত সুরসাগর হিমাংশু দত্ত, অজয় ভট্টাচার্য ও সুবোধ পুরকায়স্থের সঙ্গেও আনন্দে দিন কাটিয়ে আসতাম। এঁরাও আমাদের কুমিল্লার বাড়িতে সর্বদা আসতেন, বসে যেত গান-বাজনার বৈঠক। এভাবে কুমিল্লা, আগরতলা ও আশপাশের গ্রামাঞ্চলের আবেশ নিয়ে আবার যখন ফিরে আসতাম কলকাতার পরিবেশে, মন তখন দূরের আবেশে মগ্ন।

১৯৩০ সালে বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন চিরকালের জন্য। অত্যন্ত নিঃসহায় মনে হয়েছিল নিজেকে। এই নিদারুণ বাস্তবকে সহ্য করে নিতে বেশ কিছু দিন সময় লেগে গেল। ১৯২৫ সাল থেকে কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করার সময় বাবা কুমিল্লা বা আগরতলা থেকে নিয়মিত চিঠি লিখে উপদেশ দিতেন, উৎসাহ দিতেন। কলকাতায় থাকার ও সংগীত শেখার সব খরচ তিনি আমাকে নিয়মিত পাঠাতেন। এত দিন কোনো দায়িত্ব ছিল না আমার এবং অর্থের চিন্তাভাবনাও ছিল না। এখন আমি যেন অগাধ জলে পড়ে গেলাম। এই অবস্থায় আমি আগরতলায় বা কুমিল্লায় গিয়ে থাকলে রাজকীয় আরামেও নিশ্চিন্তে নিজেদের বাড়িতে বাস করতে পারতাম এবং রাজ্য সরকারে কোনো উচ্চপদে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতাম। আমার বড় ভাইয়েরা

আমাকে তা-ই করতে বললেন। তাঁরাও সবাই রাজ্য প্রশাসনে বিভিন্ন প্রতিপত্তিশীল পদে নিয়োজিত। আমার কিন্তু এ ব্যবস্থা মনঃপূত হলো না।

নিজে একা সংগ্রাম করে, নিজে উপার্জন করে সংগীত সাধনায় জীবন কাটিয়ে দেব, মনের মধ্যে একমাত্র এই আকঙ্ক্ষা নিয়ে কলকাতার ত্রিপুরা প্রাসাদে আমার বাসস্থান ছেড়ে, ভাড়া করা সামান্য একখানা ঘরে আমার আস্তানা বাঁধলাম। আত্মীয়স্বজন এবং রাজপরিবারের সবাই আমার এই সংকল্প একেবারেই সমর্থন করলেন না। তুমুল প্রতিবাদ উঠল রাজপরিবারের ছেলের এই সাধারণভাবে জীবনযাপনে। আমি কিন্তু কোনো কিছুর পরোয়া না করে বাড়ি থেকে কোনো অর্থসাহায্য না নিয়ে কলকাতার সেই একখানা ঘরে সংগীতসাধনা বজায় রাখলাম। খুব রেওয়াজ করতাম তখন, বড় বড় ওস্তাদদের সঙ্গ করতাম, গান-বাজনা শুনতাম। শুধু এই সংগীতের পরিবেশেই দিন কাটাতাম। এ সময় আমি গান শেখানোর কয়েকটি টিউশনিও নিলাম এবং সেই উপার্জন থেকেই আমার কলকাতার খরচ বহন করতাম।

এ সময় থেকে আমি নিজে গানের সুর রচনা করতাম এবং নিজেই গাইতাম। গানগুলো বেশির ভাগ সময় লিখতেন *নাচঘর* সাপ্তাহিকের সম্পাদক শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়। হিন্দুস্থান রেকর্ডে আমার প্রথম গান 'ডাকলে কোকিল রোজ বিহানে' তাঁর লেখা, অপরটি 'এ পথে আজ এসো প্রিয়' শৈলেন রায় রচিত। এখন থেকেই নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, নিজের স্বতন্ত্র স্টাইলে সুর রচনা করা আরম্ভ হলো। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত এই পাঁচ-ছয় বছরে লোকসংগীত ও ভারতীয় মার্গসংগীতের সংমিশ্রণে নিজস্ব ধরনে সুর রচনা করলাম, যা অন্য কারও সঙ্গে মিলল না। এভাবে আমি আমার নিজস্ব গায়কি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলাম। এতে আমাকে অনেকেই অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছেন এবং এঁদের মধ্যে আমি একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। তিনি হলেন সংগীতরসিক ও পণ্ডিত নাটোরের মহারাজা। এ ছাড়া শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল, শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ, শ্রীখগেন মিত্র, শ্রীহেমেন রায়—এঁরা তো আছেনই। এঁদের উৎসাহে ও আশীর্বাদে আমি আমার এক নিজস্ব শৈলী সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলাম এবং জনসাধারণের নিকট থেকে সমর্থনও পেয়েছিলাম আমার এই প্রচেষ্টায়, তাঁদের নিকট জনপ্রিয়তা ও সুনাম অর্জন করে।

নাটোরের মহারাজার সঙ্গে ১৯৩৫ সালে কলকাতার এক সংগীত সম্মেলনে আমার প্রথম পরিচয় হয়। আমি ওই সম্মেলনে গান গেয়েছিলাম। আমার গান তাঁর ভালো লেগেছিল এবং আমাকে তার পর থেকে তিনি সদাসর্বদা উৎসাহ প্রদান করেছেন। আমার গায়কির উচ্চ প্রশংসা করতেন সর্বত্র এবং আমাকে

তাঁর গৃহে আমন্ত্রণ করে প্রায়শই আমার গান শুনতেন। সে সময় নাটোরের মহারাজার বাড়ি ছিল ভারতের সংগীতশিল্পী ও গুণীদের সমাবেশের স্থান। কত জলসা হতো, তার ইয়ত্তা নেই। সেখানে নানা জলসায় আমি শুধু যে অন্যদের গান শুনেছি, তা নয়, নিজেও গেয়েছি।

শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল আরেক সুরের রসিক। তাঁর কাছে শুদ্ধ পদ্ধতি অনুযায়ী ঠুমরির বোল বানানো আমি শিক্ষা করেছি। ভারতীয় উচ্চসংগীতের এই পণ্ডিত ভারতের প্রথম শ্রেণীর গুণী শিল্পীদের শুধু যে গান শুনেছেন, তা নয়, তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও স্থাপন করেছেন। আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করেছেন আমার নানা রকম সংগীত প্রচেষ্টায়। এই প্রসঙ্গে *দেশ* পত্রিকায় শ্রীসান্যালের 'স্মৃতির অতলে' পর্যায়ের লেখাগুলোর উল্লেখ করা যেতে পারে। এই লেখায় ভারতীয় উচ্চসংগীতের যে মেজাজ ও বৈঠকি আবহাওয়া তিনি পাঠকদের সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন, তা অতুলনীয়।

শ্রীখগেন মিত্র ও ধূর্জটিদার সমর্থনও আমাকে সর্বদা সাহস জুগিয়েছে।

এসব প্রখ্যাত গুণী-জ্ঞানী ছাড়াও, আরেক খাঁটি সংগীতরসিক আমার সংগীতজীবনে যে সাহায্য করেছেন, তা ভোলার নয়। সংগীতে মশগুল এ রকম আপনভোলা ব্যক্তি আমি আর দেখিনি। এঁর নাম হলো শ্রীভবসিন্ধু মুখোপাধ্যায়। তিনি উঁচু দরের সংগীতশিল্পী হলেও বাইরে কখনো কোনো গান-বাজনা করতেন না। অথচ গলায় তাঁর সুর ছিল অপূর্ব, সেতার ও এসরাজ বাদনে সুদক্ষ। এই সুরের মাধ্যমে ভবসিন্ধু আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গেল, আমাকে একেবারে আপন করে নিয়েছিল। আমার প্রায় সব জলসায়, সে নিজের আহ্লাদে ও আনন্দে সাধ করে তার সাজ নিয়ে আমার সঙ্গে যেত ও সুরের আনন্দে বিভোর হয়ে কখনো তার সেতার, কখনো এসরাজ বাজিয়ে আমার গানের সুরে সুরে এক হয়ে যেত। আমার বাড়িতে প্রায়ই চলে আসত তার যন্ত্র-সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে, আপনভোলা মনে বাজিয়ে যেত আমার গানের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তার কোনো হুঁশই থাকত না। আবার এমনও হয়েছে, আমার একটা কোনো গলার কাজ শুনে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে চলে গেছে। পরে বলেছে, আমি ওই কাজের পর অন্য কিছু শুনতে চাইনি, কারণ তাঁর আমেজ যদি নষ্ট হয়ে যায়। এই রকমই সংগীতরসিক ছিল ভবসিন্ধু। আমার ওই যুগের সংগীতসাধনাকে সে সত্যিই উদ্দীপিত করেছিল।

৩

শ্রীহেমেন রায়ই আমাকে প্রথম কলকাতায় পেশাদার রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন। আগেই বলেছি, তাঁর রচিত গানেই আমি প্রথম নিয়মিত সুর-সংযোজনা আরম্ভ করি। তাঁরই উদ্যোগে নাট্যমন্দিরে *সতীতীর্থ* ও *জননী* এ দুটি নাটকের আমি সংগীত রচনা করি। সে সময় রঙ্গমঞ্চের জন্য আমার এই সংগীত রচনা শ্রোতাদের প্রশংসা পেয়েছিল। পত্র-পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল আমার সুর রচনা। কলকাতার রঙ্গমঞ্চে তখন শ্রীমতী নীহারবালা ছিলেন গানের জন্য বিখ্যাত। তাঁকে আমি গান শেখাই এবং নাটকে শ্রীমতী নীহারবালা আমার রচিত সুরে গান করেন।

সতীতীর্থ-এ ছিল নয়টি গান, সব কটির সুরই আমার দেওয়া। নাটকের তখনকার দিনের এই জনপ্রিয় গানগুলো অনেকেরই মনে থাকবে। যেমন 'চোখের জলে ভিজিয়ে দিলাম গলার বেলার মালা', 'চল রাহী তুই রতনপুরে' বা 'যৌবন আজ দুলিয়ে দিলে' ইত্যাদি।

কলকাতার রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত থাকাকালে আরও অনেক গুণী শিল্পী-সাহিত্যিকের সান্নিধ্যে এসেছিলাম এবং এঁরা সবাই আমার গান ও সুরারোপ শুনতে ভালোবাসতেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গাঙ্গুলি, যোগেশ চৌধুরী, নরেশ মিত্র, অহীন্দ্র চৌধুরী এবং সর্বোপরি শিশির ভাদুড়ী। এঁদের সবাইকে আমি বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম। এরাও সবাই আমার গান শুনতে খুব ভালোবাসতেন। এই একই সময়ে আমি রঙ্গমঞ্চের প্রতিও খুব আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। কলকাতার রঙ্গমঞ্চে এমন কোনো নতুন প্রযোজনা ছিল না, যা আমি না দেখতাম। ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলি পরে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হন। জহর গাঙ্গুলি ও আমি দুজনেই ছিলাম

ফুটবল খেলারও ভক্ত। কিন্তু সে ছিল মোহনবাগানের সমর্থক, আমি ইস্টবেঙ্গলের। কোনো দিন মোহনবাগান যদি হেরে যেত, জহর আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিত বা বহু সময় ইস্টবেঙ্গল হেরে গেলে আমাদের মধ্যে রীতিমতো মন কষাকষি হয়ে যেত।

আজ জীবনের সায়াহ্নে যখন উপরোক্ত সব গুণী শিল্পী-সাহিত্যিক, পণ্ডিত ব্যক্তির কথা মনে পড়ে, তখন মন বড় বিহ্বল হয়ে যায়। এঁদের অনেকেই আজ আর নেই। কিন্তু সে ছিল এক সৃষ্টির যুগ, এঁদের সবার মধ্যেই ছিল সৃষ্টির আনন্দ। কঠোর সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তখন সবাইকে যেতে হলেও তার মধ্যে ছিল অপরিসীম আনন্দ। আবার যদি সেসব দিন ফিরে পেতাম!

একই সময় চলচ্চিত্রের বিখ্যাত প্রযোজক ও পরিচালক শ্রীমধু বসুর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটে। তাঁর নির্দেশনায় যখনই কোনো মঞ্চাভিনয় বা চলচ্চিত্র হয়েছে, আমি তা দেখতে গিয়েছি। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী সাধনাও আমার কাছে গান শিখেছিলেন। আগেই বলেছি, মধু বসুর *সেলিমা* নামের একটি ছবিতে আমি গান গেয়েছিলাম একটি ভিখারির ভূমিকায়। মধুবাবু তাঁর আত্মজীবনী *আমার জীবন* পুস্তকে এ বিষয়ে যা লিখেছেন, তা এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না—

'চৌরঙ্গী প্লেসে বর্তমান রকসী সিনেমার পাশেই একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিলাম। নতুন করে আবার সংসার পাতলাম সেখানে ১৯৩৩ সালের গোড়ায়।...সাধনা ঐ সঙ্গে আবার নতুন করে গান শিখতেও লাগল। সে সময়ে আমাদের ফ্ল্যাটে প্রায়ই গান-বাজনার আসর বসত; এই আসরে প্রায় নিয়মিতভাবে যারা আসত তাদের মধ্যে মিহিরবাবু (তিমিরবরণের দাদা মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য্য), শচীন দেববর্মন ও হিমুর (হিমাংশু দত্ত—সুরসাগর) নাম বেশি করে মনে পড়ছে। আমি শচীনকে সাধনার গান শেখার আগ্রহের কথা বলতে সে অত্যন্ত খুশি মনে তাকে শেখাতে চাইল, এবং বলা বাহুল্য, এর জন্য কোনরকম পারিশ্রমিক নিতে সে রাজি হল না।...

'২৭শে এপ্রিল ১৯২৪ ভোরবেলায় বাবা পরলোকের দিকে যাত্রা করলেন। 'সেলিমা'র স্যুটিং অবিলম্বে করবার তাগিদ আসায় আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও কলকাতা চলে আসতে হল।...সেলিমার একটি ছোট্ট ভূমিকায় অভিনয় করেছিল, আজকের দিনের বিখ্যাত এক সঙ্গীত-পরিচালক। এই ভূমিকাটি ছিল এক ভিখারীর। এই সঙ্গীত-পরিচালক তখন গাইয়ে হিসাবে সবে নাম করেছে এবং সাধনাকে গান শেখাত। তাকে একদিন কথায় কথায় বললাম, একটি ছোট্ট ভিখারীর ভূমিকা আছে— কাজ বিশেষ কিছু নেই— শুধু বসে বসে

একটি গান করতে হবে আর কিছু নয়। শুনে প্রথমে সে চমকে উঠল, বলল—বলেন কি মিঃ বোস? আমি ফিল্মে নামব কি? জানেন তো আমার পরিবারকে। আমি যদি ফিল্মে নামি, তাহলে তাঁরা নির্ঘাত আমায় একঘরে করবেন। আমি গান করি, তাইতেই কত লোক কত কথা বলে। আমি বললাম, তোমার এমন করে মেকআপ করে দেব, দাড়ি গোঁফ লাগিয়ে যে কেউ চিনতেই পারবে না। তারপর অনেক করে বোঝাতে শেষটায় সে রাজি হল। গানটি সে খুবই ভালো গেয়ে ছিল। এই ব্যক্তিটি হলো আজকের বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক কুমার শচীন দেববর্মন।'

কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গেও দীর্ঘকাল ধরে আমার ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি আমাকে যথেষ্ট ভালোবাসতেন এবং আমি তাঁর স্নেহধন্য শিল্পী। তাঁর রচনা, গান, কবিতা, আবৃত্তি আমি বহু শুনেছি। তিনিও আমার গান ও সুর খুবই পছন্দ করতেন। আমার বাড়িতে আসতেন, মুগ্ধ করতেন কবিতা ও গানে। আমার নিজস্ব ধরনে গানে সুর দিয়ে তাঁকে যখনই শুনিয়েছি, উৎসাহিত করেছেন আমাকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায়। তাঁর রচিত গান রেকর্ড করতে আমাকে আদেশও দিয়েছিলেন। আমার জন্যই বিশেষভাবে সেগুলো রচনা করেছিলেন তিনি। আমি তা রেকর্ডও করেছিলাম এবং সব কটি গানই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল কাজীদার রচনার গুণে। অনেকেই আমার গাওয়া 'চোখ গেল, চোখ গেল, কেন ডাকিস রে—চোখ গেল পাখি রে' গানটি শুনেছেন। এটি কাজীদার রচিত। প্রায় চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যে লিখেছিলেন আমার জন্য সুর দিয়ে। আমি কাজীদাকে বলেছিলাম, ঝুমুরের ধরনে একটু 'টিকলিশ' সুরের গান দিন আমাকে। কাজীদা প্রায়ই সঙ্গে সঙ্গেই দিলেন ওই গানটি উপহার। কাজীদার সঙ্গলাভ আমার জীবনের অন্যতম প্রধান ঘটনা।

হিন্দুস্থান প্রোডাক্টসে আমি প্রথম আমার গান রেকর্ড করা শুরি করি এ সময়। আগেই বলেছি, আমার নিজের সুরে যে দুখানা বাংলা গান সর্বপ্রথম রেকর্ড করেছিলাম, তার একটির প্রথম লাইন ছিল 'ডাকলে কোকিল রোজ বিহানে মাঠের বাটে যাই' গানটির লেখক শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়। অপর গানটির প্রথম লাইন ছিল 'এই পথে আজ এসো প্রিয়, কেরো না আর ভুল' এই গানটি লিখেছিলেন শ্রীশৈলেন রায়। নিজের গলা, নিজে শুনছি। প্রথম প্রথম সে ছিল এক থ্রিলিং ব্যাপার আমার কাছে। এর পর থেকে আমার গাওয়া আরও গান রেকর্ড করেছে হিন্দুস্থান কোম্পানি, যার বেশির ভাগই বাংলা গান। কয়েকটি হিন্দি গানও আছে তার মধ্যে। খুব সম্ভব ১৯৪৭ সাল থেকে হিজ মাস্টারস ভয়েসে গান রেকর্ড করা শুরু হয়। প্রথম দিকে হেমেন্দ্র রায়

আমার গান লিখতেন, পরে সুধীরেন্দ্র সান্যাল এবং শৈলেন রায়ও লিখেছেন আমার জন্য বহু গান।

এ সময় আমি শ্রীঅজয় ভট্টাচার্যকে লিখলাম কলকাতা চলে আসতে এবং আমার জন্য গান লিখতে। অজয় তখন চলে এল কলকাতায় সঙ্গে সঙ্গে। সে আসার পর আমার সব গান অজয়ই লিখত। তারপর অসময়ে অজয় যখন আমাদের ছেড়ে চলে গেল, তখন আমার জন্য গান লিখল শ্রীগৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও শ্রীরবি মজুমদার। এদের লেখা বহু গান আমি রেকর্ড করেছি।

সর্বপ্রকার কলাবিদ্যাই আমাকে চিরকাল আকৃষ্ট করেছে। চিত্রকলা, নৃত্য, মঞ্চাভিনয় ইত্যাদি কত কি। ১৯৩৫ সালে শ্রীমতী বালা সরস্বতীর ভারতনাট্যম নৃত্য প্রথম দেখি কলকাতায়। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম এই শিল্পীর নৃত্য ও অভিনয়ে। উদয়শঙ্কর ছিলেন আমার প্রিয় নৃত্যশিল্পী। তাঁর কোনো অনুষ্ঠান কলকাতায় যখনই হতো, আমি তা দেখতাম। উদয়শঙ্করের গুরু শ্রীনাম্বুদ্রির নাচ দেখে অভিভূত হয়েছিলাম। কলকাতায় কোনো ভালো অনুষ্ঠানই বাদ দিতাম না। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের নৃত্যনাট্য কবিগুরুর তত্ত্বাবধানে কলকাতাতে বহুবার দেখেছি। এ ছাড়া সেরাইকেলার ছৌ নাচ, লক্ষ্ণৌর শ্রীঅচ্ছন মহারাজ, শ্রীশম্ভু মহারাজের নাচ। শম্ভু মহারাজের ঠুমরি গান এবং সেসব গানের বোল সব সময় আমাকে আকৃষ্ট করেছে। আমাদের আগরতলা মণিপুরি নৃত্যেরও অন্যতম কেন্দ্র ছিল। শ্রেষ্ঠ বহু মণিপুরি নৃত্যশিল্পীদের নাচ দেখারও সৌভাগ্য হয়েছে আমার। কলকাতায় পাশ্চাত্যের অ্যানা পাভলোভার নাচও দেখেছিলাম। পরবর্তীকালে বিদেশে মস্কো, লেলিনগ্রাদ, হেলসিংকি, লন্ডন, প্যারিস প্রভৃতি শহরে নানা প্রকার ব্যালে-অপেরা সংগীতানুষ্ঠান, আধুনিক গান ও নাচের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছি। হেলসিংকি বা মস্কোর যুব উৎসবে পৃথিবীর নানা দেশের সংগীত, লোকসংগীত ও উচ্চাঙ্গসংগীত শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। সংগীত আমার প্রথম আকর্ষণ হলেও নৃত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্যও আমাকে একইভাবে আকৃষ্ট করেছে। ভাস্কর্যের কথায় প্রখ্যাত ভাস্কর শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কথা বলতে হয়। তাঁর ভগিনী আমার বড় বৌদি। সেই সূত্রে দেবীপ্রসাদের সঙ্গে আমার অত্যন্ত প্রীতি ও আত্মীয়তার সম্পর্ক। তিনি আমার গানের খাতার ওপরের মলাটে 'সুরের পূজা' আইডিয়াতে এক অপূর্ব ছবি এঁকে দিয়েছিলেন, যা এখনো আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি। দেবীপ্রসাদবাবু মাদ্রাজে সরকারি আর্ট কলেজে যোগ দিয়ে সেখানে বসবাস করতে লাগলেন; আর আমিও ১৯৪৪ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘোরের মধ্যে বম্বে চলে এলাম। শুরু হলো আমার জীবনের তৃতীয় পর্বের মহাযুদ্ধ।

৪

১৯৩৪ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় অল ইন্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সে আমি প্রথম নিমন্ত্রিত হলাম। বাংলাদেশের বাইরে বড় বড় ও বিখ্যাত সংগীত সম্মেলনে যোগদান আমার কাছে শুধু যে বিশেষ সম্মান বলে মনে হয়েছিল তা নয়, একে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ বলেও মনে হলো। ভগবানের ইচ্ছায় ওই সম্মেলনে আমি ঠুমরি ও নিজস্ব সুরে ও স্টাইলে বাংলা গান গেয়ে খুব সুনাম অর্জন করেছিলাম। সে বছর আমার সংগীত আমি ভালোভাবেই রসিক ও সমঝদারদের সম্মুখে পেশ করতে পেরেছিলাম বলে আনন্দে ভরে উঠেছিল মন। এই সম্মেলনে প্রথম পরিচয় হলো খাঁ সাহেব ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁর সঙ্গে। তিনি আমাকে আশীর্বাদ করলেন গান শুনে। এরপর যতবার কলকাতায় এসেছেন, আমি তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছি ও প্রাণভরে গান শুনেছি।

এই সম্মেলনে জীবনে সর্বপ্রথম অটোগ্রাফ সই দিয়েছিলাম মনে আছে। সে কী যে আত্মপ্রসাদ মনে হয়েছিল সেদিন ওই সামান্য অটোগ্রাফ দিয়ে, তা বোঝানো মুশকিল। এই সম্মেলনে শ্রোতারূপে উপস্থিত ছিলেন তেজবাহাদুর সপরু, ডা. কৈলাস নাথ কাটজু, শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত প্রমুখ। ডা. কাটজু আমাকে মেডেল উপহার দিয়েছিলেন।

এই সম্মেলনে পরবর্তী তিন বছরও আমি আমন্ত্রিত হয়েছিলাম এবং গেয়েছিলাম। কলকাতা সংগীত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করলাম পরের বছর ১৯৩৫ সালে। এই রকম কলকাতার এক সম্মেলনে, যাতে ১৯৩৫ সালে আমিও গান করেছিলাম, ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। পরে তিনি যখনই কলকাতায় আসতেন, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতাম এবং সময়

কাটাতাম। তাঁর সব সংগীত অনুষ্ঠানে আমিও হাজির হতাম ওঁর সঙ্গে। খাঁ সাহেবও আমাকে বেশ স্নেহের চোখে দেখতেন।

একইভাবে খাঁ সাহেব ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর সঙ্গেও আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয় এবং তাঁর স্নেহ অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করি।

এসব সংগীত সম্মেলনের স্মৃতি ও সেই সঙ্গে নানা রসিক সুধী ও গুণীজনের সান্নিধ্য লাভ আমার জীবনের সব উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সে সময় বাংলাদেশের উচ্চাঙ্গসংগীতের শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁর গানের এক অপূর্ব নিজস্ব স্টাইল আমাকে মুগ্ধ করেছিল। কিছুকাল আমি তাঁর কাছে সংগীত শিক্ষা লাভ করি।

এ ছাড়া এলাহাবাদের প্রখ্যাত সংগীতপ্রেমী, সমঝদার, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীদক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য, বিখ্যাত আইনজ্ঞ শ্রীমল্লিক, শ্রীগিরিজাশঙ্কর বাজপাই প্রভৃতি গুণী ব্যক্তিরাও আমার গান শুনে আমাকে আপন করে নিয়েছিলেন। আমি এলাহাবাদে গেলে এঁরা আমাকে সর্বদাই নিজগৃহে আমন্ত্রণ জানাতেন এবং জমত গানের আসর। সব সংগীতশিল্পীরাই শ্রীভট্টাচার্য ও শ্রীমল্লিককে খুবই শ্রদ্ধা করতেন।

শিশুকাল থেকেই বাংলাদেশের পল্লিসংগীতের সঙ্গে আমি বেশি পরিচিত। যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের লোকসংগীত সম্বন্ধে ১৯৩৪ সাল থেকে সম্মেলনের পর নানা স্থান ঘুরে পরিচয় গ্রহণ করলাম। এই দুটি প্রদেশের গ্রামাঞ্চলের নানা দেহাতিগানের আসরে যোগ দিয়ে সেসব গ্রাম্যসংগীত সংগ্রহ করে আমার পুঁজি বৃদ্ধি করলাম।

১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত আমি I.P.T.A-এর সংগীত বিভাগের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। এই Indian Peoples Theatres Association আমাকে ওদের বাংলা লোকসংগীত শাখার সভাপতি করেছিল। এই সমিতিতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রখ্যাত গায়কদের সমাবেশ ঘটেছিল এবং আমিও নানা রাজ্যের প্রতিনিধিদের সংস্পর্শে এসে তাঁদের গান শুনে নিজের জ্ঞান ও সংগ্রহ আরও বাড়ালাম। আমি ১৯৪৪ সালে প্রথম যখন বম্বে গেলাম, তখন এই সমিতির বম্বে শাখার বিভিন্ন সংগীতানুষ্ঠানে, বিশেষ করে স্বর্গত শ্রীশান্তি বর্ধনের নৃত্যানুষ্ঠানে নিয়মিত যোগ দিতাম। শান্তি বর্ধন ছিলেন অত্যন্ত গুণী নতুন সৃজনকারী শিল্পী। তাঁর নানা রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমাকে মুগ্ধ করত। বম্বের আন্ধেরি অঞ্চলে শ্রীবর্ধনের সেই কেন্দ্রটির স্মৃতি সর্বদা মনে পড়ে। এই গুণী শিল্পীর অকালমৃত্যু খুবই ক্ষতিকর হয়েছে।

আইপিটিএর সঙ্গে জড়িত থাকাকালে বুঝতে পারলাম, ভারতবর্ষের লোকসংগীত কত বিচিত্র এবং বৃহৎ সংগীতসম্পদে পুষ্ট।

১৯৩০ সালে পিতৃদেবের মৃত্যুর পর নিজের চেষ্টায় নিজস্ব এক গায়কি সৃষ্টি করে সংগীতশিল্পীরূপে কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলাম। অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে আমার গান নিয়মিত প্রচারিত হতে লাগল প্রতি মাসে। এ ছাড়া নিজের গানের রেকর্ড করতে লাগলাম। কলকাতা ও এলাহাবাদ সংগীত সম্মেলনে যোগদান এবং নানা জলসায় গান গাইবার আমন্ত্রণ পেতে লাগলাম। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আমার কিছুটা জনপ্রিয়তা থাকায় তারা আমাকে সদাসর্বদা আমন্ত্রণ জানাত তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান করার জন্য। দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজায় টানাটানি পড়ে যেত। এভাবে আর্থিক ক্ষেত্রেও আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হলাম।

এবার আমি দুটি ঘরের একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করলাম। একটি ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা, অন্য ঘরে আমার গান শেখানোর স্কুল। নাম দিলাম 'সুরমন্দির'। খুব সামান্য ফি নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের গান শেখাতাম, আমার গায়কিতে। দুস্থ ছাত্র—সংগীতে প্রতিশ্রুতি থাকলে তাদের কাছ থেকে আমি কোনো ফি নিতাম না। আমার এই স্কুল ও তার ছাত্রছাত্রীরা কিছুদিনের মধ্যেই বেশ সুনাম অর্জন করল। ছাত্রদের নিয়ে বেশ আনন্দে, গান-বাজনায় আমার দিন কেটে যেতে লাগল। সরস্বতীপূজার সময় ছাত্ররাই উৎসাহ নিয়ে সুরমন্দিরে সরস্বতীপূজা করত এবং সারা রাত গান-বাজনা চলত। এভাবেই হোলির সময়েও আমার ফ্ল্যাট দিনরাত মুখরিত হয়ে থাকত গান-বাজনায়। বহু গুণী-জ্ঞানী আমার এই ক্ষুদ্র সংগীতবিদ্যালয়ে পদধূলি দিয়েছেন।

বঙ্গাব্দ ১৩৪৫-এর বৈশাখ মাসে (ইং ১৯৩৯ সাল) আমি *সুরের লিখন* নামের একটি সংগীতপুস্তিকা প্রকাশ করি। এতে আমার পঁচিশটি গান স্বরলিপিসহ ছাপাই। প্রকাশক ছিল ডি এম লাইব্রেরি। বইটি উৎসর্গ করেছিলাম স্বর্গত পিতা মহারাজকুমার শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মনের নামে।

বাংলা চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালনা করার আকাঙ্ক্ষা ছিল খুব। কিন্তু কোনো সুযোগই পাচ্ছিলাম না। আমি নিউ থিয়েটারসে ঘোরাফেরা করেছিলাম অনেক, আশাও পেয়েছিলাম কর্তাস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট থেকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আশা আর সফল হলো না। তখনকার দিনে নিউ থিয়েটারসের খ্যাতনামা বহু পরিচালকের নিকট আমি অপরিচিত ছিলাম না, যেমন শ্রীনীতিন বসু আমার বন্ধু শ্রীহেমচন্দ্র ও শ্রীদেবকী বসু। এঁরা সবাই আমার গান, সুর-সংযোজনার প্রশংসা করতেন। স্বনামধন্য শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া ও আমি তো

একসঙ্গে টেনিস খেলতাম। এসব সত্ত্বেও কোনো তরফ থেকে সাড়া না পাওয়ায় আমার মনে কিছু অভিমানও জেগেছিল। মাঝে মাঝে আমার মনে হতো, হয়তো আমার সুর জনসাধারণের আনন্দদানে কোনো কাজের নয়। সায়গল, পাহাড়ী সান্যাল এরাও আমার বিশেষ বন্ধু। সায়গলের সঙ্গে কলকাতার বাইরে—যেমন রাঁচিতে অনেকবার গান গাইতে গিয়েছি। নিউ থিয়েটারসের কর্ণধার শ্রী বি এন সরকারও আমার সুর-সংযোজনা সম্বন্ধে জানতেন, পরিচয়ও হয়েছিল। এসব সত্ত্বেও কোথাও কোনো চলচ্চিত্র সংস্থা আমাকে সংগীত পরিচালনা করার সুযোগ না দেওয়ায় মনে খুবই দুঃখ হয়েছিল। অথচ বাংলা ছবিতে আমি সুর যে দিইনি, তা নয়—দুটো ছবির কথা মনে পড়ছে যেমন *রাজগী* ও *রাজ-কুমারের নির্বাসন*।

৫

১৯৩৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি স্বর্গত জজ রায়বাহাদুর শ্রীকমলানাথ দাশগুপ্তের দৌহিত্রী শ্রীমতী মীরার সঙ্গে কলকাতায় আমার বিয়ে হয়। আমার বিয়ে উপলক্ষে আগরতলা থেকে মা, বড় ভাই, বউদিরা এবং অন্য আত্মীয়স্বজন কলকাতায় এসেছিলেন। মীরা ১৯৩৭ সাল থেকে আমার কাছে গান শিখত। আমার ট্রেনিংয়ে কয়েকটি গান রেকর্ডও করেছিল। ১৯৩৭ সালে এলাহাবাদ সংগীত সম্মেলনে মীরাও গান করার সুযোগ পেয়েছিল আমারই মতো। সে সময় মীরা ভীষ্মদেবের কাছে উচ্চাঙ্গসংগীত ও শান্তিনিকেতনের শ্রীমতী অমিতা সেনের (পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের কনিষ্ঠ কন্যা) কাছে নাচ শিখত। পরে মীরা শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের কাছে ঠুমরি ও কীর্তন এবং শ্রীঅনাদি দস্তিদারের কাছে রবীন্দ্রসংগীতও শিখেছিল। আমার সঙ্গে ১৯৪৪ সালে বম্বে আসার পর মীরা বম্বেতে কিরানা ঘরানার ওস্তাদ ফৈয়াজ মহম্মদ খানের কাছে উচ্চাঙ্গসংগীত শেখে। মীরা রেডিওতে গান গাওয়া ছাড়াও আমার তত্ত্বাবধানে এইচএমভিতে কয়েকটি হিন্দি গানও রেকর্ড করে।

মীরা নিজে শুধু যে গান লেখে তা নয়, সুর-সংযোজনাতেও পারদর্শিনী। ওর সাহায্য ও সাহচর্যে আমি আমার অনেক সফল ও জনপ্রিয় গানের সুর দিয়েছি। আমার সুর রচনায় অনেকগুলো জনপ্রিয় গানের মুখড়ার সুর মীরার। বহু সময় এ রকমও হয়েছে, আমি সুর রচনা করেছি, তার ওপর ভিত্তি করে মীরা বাংলায় গান লিখেছে সুরের মিটার ও ছন্দ অনুযায়ী, হিন্দি গান রচয়িতাকে তা বোঝাবার জন্য। পরে সেই সুরে হিন্দি গান রচনা হয়েছে। মীরার লেখা ছয়খানা বাংলা গান আমি এইচএমভিতে রেকর্ডও করেছি, নিজের গলায়। কেবল সহধর্মিণীরূপে নয়, আমার সংগীতজীবনের সাফল্যের

পেছনে মীরার সহযোগিতা, সাহায্য, প্রেরণা, উৎসাহ ও আত্মত্যাগ প্রচ্ছন্নভাবে সর্বদাই বর্তমান রয়েছে ও থাকবে। আমি মীরার মতো সহধর্মিণী লাভ করে নিজেকে সর্বদাই অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করেছি।

আমাদের একমাত্র সন্তান শ্রীমান রাহুলের জন্ম হয় ১৯৩৯ সালের ২৭ জুন। শিশুকাল থেকেই গান-বাজনার ওপর রাহুলের অসাধারণ ঝোঁক দেখে ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ সাহেবের কাছে ওর সরোদ শেখার ব্যবস্থা করে দিলাম কলকাতায়। পরে যখন চলচ্চিত্রের সুর-সংযোজনায় ওর ইচ্ছা লক্ষ করলাম, তখন ওকে নিয়ে এলাম বম্বে ১৯৫৯ সালে। আমার সহকারীরূপে হিন্দি চলচ্চিত্রের সংগীত রচনায় ওকে তৈরি করতে লাগলাম। এখন রাহুল বম্বে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে, সংগীত-পরিচালকরূপে সুনামও অর্জন করেছে। তরুণদের কাছে তার সংগীত রচনা খুবই জনপ্রিয়। এখন সে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজেই সংগীত পরিচালনা করছে।

বম্বে সংগীত পরিচালনা করার প্রথম আহ্বান আমি পাই ১৯৪২ সালে, সর্দার শ্রীচণ্ডুলাল শার কাছ থেকে। তিনি তখন বম্বের বিখ্যাত রঞ্জিত স্টুডিওর মালিক। কিন্তু কেন জানি না, ১৯৪২ সালে কলকাতা ছেড়ে বম্বে আসতে মন চাইল না। তখনো আশা যে কলকাতায় বাংলা চলচ্চিত্রে কাজ পাব। তখন এলাম না বলে চণ্ডুলাল দুঃখিত হয়েছিলেন। বম্বে পরে যখন দেখা হয়, উনি অনুযোগ করেছিলেন তখন না আসাতে।

'ফিল্মিস্তান' চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের মালিক রায় বাহাদুর শ্রীচুনীলাল ও শ্রীশশধর মুখার্জি ১৯৪৪ সালে আমাকে তাঁদের একটি ছবিতে সংগীত রচনা করতে আমন্ত্রণ জানান। তখনো আমি দোনামনা করছিলাম। সেই সময় বন্ধুবর শ্রীসুশীল মজুমদার ফিল্মিস্তানে কাজ করতেন। তিনি বারবার আমাকে বম্বে চলে আসার জন্য লেখেন এবং সেই সুযোগ অবহেলা না করে ফিল্মিস্তানে কাজ নিতে বলেন।

কলকাতার চলচ্চিত্র-জগৎ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে মনের মধ্যে কিছু ক্ষোভ ও অভিমান নিয়ে আমি ফিল্মিস্তানের আহ্বানে ১৯৪৪ সালে বম্বে চলে এলাম সপরিবারে। ওই বছরের অক্টোবর মাসে স্ত্রী-পুত্রসহ বম্বে এসে ফিল্মিস্তানে যোগ দিলাম সংগীত পরিচালকরূপে।

দেখলাম, বম্বে বেশ মাজাঘষা শহর। সেখানে সব সময় কর্মব্যস্ততা এবং কলকাতার চেয়ে অনেক বেশি কসমোপলিটন। বিখ্যাত সংগীতশিল্পী শ্রীপান্নালাল ঘোষ, সংগীত পরিচালক শ্রীঅনিল বিশ্বাস, অভিনেতা শ্রীপাহাড়ী সান্যাল, শব্দযন্ত্রী শ্রীরবীন চ্যাটার্জি—এঁদের সঙ্গে দেখা হলো আবার বম্বেতে।

কিন্তু প্রথম প্রথম কেমন যেন মনে হলো। যে দেশে গঙ্গা নেই, সে দেশের মাটি রুক্ষ; যে দেশে আলসেমি নেই, সে দেশে প্রথমটায় কোনো প্রাণের সাড়াই যেন পেলাম না। প্রথমটায় বড় নিঃসঙ্গ বোধ করতাম নিজেকে। কলকাতার আমার সব গুণী বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত পরিবেশ থেকে বম্বে কেমন যেন আমাকে মনমরা করে দিয়েছিল প্রথমে।

বম্বেতে আমার প্রথম সংগীত পরিচালনা ফিল্মিস্তানের ছবি *শিকারী*। ছবির নায়ক শ্রীঅশোককুমার। আমার সুরে তিনি গান করেছিলেন। আমরা সবাই তাঁকে 'দাদামণি' বলে ডাকি। বিখ্যাত গীতিকার শ্রীপ্রদীপ ছবির গান রচয়িতা। সংগীত পরিচালকরূপে এই ছবিতেই প্রথম নাম বেরোল আমার। প্রথম ছবির সুর রচনা ও সংগীত পরিচালনা প্রশংসা পেল পত্র-পত্রিকার। এরপর ফিল্মিস্তানে আরও পাঁচটি ছবির আমি সংগীত পরিচালনা করি। সেগুলোর নাম *এইট ডেজ, দো ভাই, শবনম, পেয়িং গেস্ট* ও *মুনীমজী*। *শবনম*-এর সব গানই হিট হয়ে গেল। প্রথম ছবি *শিকারী*র সুর রচনার সময় স্টুডিওর সবাই খুব প্রশংসা করেছিল আমার সংগীতের; কিন্তু কেন জানি না, আমি খুশি হতে পারিনি। স্টুডিওর বাইরে জনসাধারণের তেমন কোনো সাড়া পেলাম না, আমার সুরে, যাকে বলে Public Pulse-এ কোনো ভালোমন্দ বোঝা গেল না। *শিকারী* মুক্তি পাওয়ার কিছু দিন পর, শ্রীযামিনী দেওয়ানের *রতন* ছবি মুক্তি পেল। পুরো বম্বে শহর *রতন* ছবির গানে ছেয়ে গেল। জনসাধারণের মুখে মুখে গানগুলো প্রচারিত হলো। ফিল্মিস্তানে আমার ঘরে বসে আমি একদিন হারমোনিয়াম নিয়ে সুর রচনায় ব্যস্ত। হঠাৎ কানে এল, আমার বেয়ারা ছোঁকরাটির গলায় গান, চা তৈরি করতে করতে সে গাইছিল, 'যব তুমহি চলে পরদেশ, লাগাকার ঠেস, ওপ্রীতম পেয়ারা দুনিয়া মে কৌন হামারা' *রতন* ছবির গান। তখন এই গানটি বম্বের রাস্তাঘাটে সর্বত্র শুনতে পাওয়া যেত। সেদিন আর কাজ করলাম না। এই রুম বয় এত দিন আমার সঙ্গে কাজ করছে, রাতদিন আমার গানের রচনা শুনছে, কিন্তু কই, কোনো দিন আমার গানের রচনা তাকে তো গুনগুন করতে শুনিনি? কিছু দিন পর আমার চোখ খুলে গেল। ইউরেকা! কয়েক দিন বাদে *দো ভাই* ছবির একটা দুঃখের গানের সুর দেওয়ায় ব্যস্ত, যার প্রথম লাইন 'মেরা সুন্দর স্বপ্না বিত গ্যায়া'। পাশের ঘর থেকে আমার সেই রুম বয়কে ওই গানখানা মশগুল হয়ে গাইতে শুনলাম। আমার কাছে আমার চলচ্চিত্রজীবনের সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতার উন্মোচন হলো এতে। তখনই বুঝতে পারলাম, ফিল্মের হিট গান মানে হলো অতি সোজা সুর, যত কম অলংকার থাকে, ততই ভালো কারণ, তাহলে

সাধারণ লোকও সে গানের সুর নিজের গলায় তুলতে পারে। চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালকরূপে আমার প্রথম গুরু হলো স্টুডিওর ওই 'রুম বয়'। এরপর *শবনম* ছবির গানের সুর দেওয়ার সময় লুকিয়ে লুকিয়ে খেয়াল করার চেষ্টা করেছি, রুম বয় আমার সুরে কোনো সাড়া দেয় কি না। *শবনম* ছবির যেসব গান ওই রুম বয় গুনগুন করত, সেগুলোই হিট হয়েছিল।

৬

১৯৪৪ সাল থেকে ১৯৪৯ সালের মধ্যে বম্বের বহু খ্যাতনামা প্রযোজক ও পরিচালকের সঙ্গে আমার আলাপ হলো। *শবনম* ছবির সাফল্যে আমার খুব নাম হওয়াতে খুশিই হয়েছিলাম। কিন্তু মনে মনে একটি দুঃখ রয়ে গেল। আমার নিজস্ব স্টাইল বা গায়কি হিন্দি পাবলিক এখনো নিল না। অর্থকষ্ট হয়তো আমার আর হবে না, কিন্তু আমার মনঃকষ্ট যাবে না, যতক্ষণ না আমার নিজস্ব ধরনের সুর রচনা সাধারণ হিন্দি শ্রোতারা আদরের সঙ্গে না গ্রহণ করবে। এখানেও যেন বাঙ্গালের গোঁ আমাকে পেয়ে বসল, আমি সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে তবে ছাড়ব।

দেব আনন্দের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৪৮ সালে। তখন সে সবেমাত্র ফিল্মে হিরো হয়েছে। দেব আনন্দ ছিল আমার গানের পাগল। বম্বের পালি হিলে দেব, তার বড় ভাই চেতন, ছোট ভাই বিজয় (গোল্ডি) আর বোনেরা থাকত। সন্ধ্যার পর ওদের বাড়িতে আমাদের আড্ডা হতো। সেখানে আমাদের বন্ধু গুরু দত্তও আসত। গুরু দত্ত ছিল আমার গানের আরেক ভক্ত। দেব ও গুরুর মতো আমার গানের অনুরাগী ভক্ত বম্বেতে আর কেউ ছিল না। ওরা দুজনে প্রায়ই শায়ন-এ আমার ফ্ল্যাটে চলে আসত গান শুনতে। আলাপ-আলোচনার মধ্যে আমরা সবাই মিলে একটি নতুন চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি—এসব ইচ্ছাও দানা বাঁধল। কোনো প্রকার ফরমুলার মধ্যে না গিয়ে আমাদের এই প্রতিষ্ঠান নতুন পথে যাবে—এসব কথাও হতো। দেব, চেতন, বিজয়, গুরু সবাই আমাকে কোনো প্রকার আপস না করে আমার নিজস্ব ধরনে সংগীত রচনায় উৎসাহ দিত। তখন

আমার মনে আত্মবিশ্বাস জাগল যে একদিন না একদিন আমার সুর হিন্দি ছবির মাধ্যমে সারা ভারতবর্ষে জনপ্রিয় করে তুলব। যে সুযোগের অপেক্ষা করছিলাম, তা এসে গেল। দেব নতুন প্রতিষ্ঠান করল 'নবকেতন' (নতুন পতাকা) নাম দিয়ে। প্রথম ছবি স্থির হলো *অফিসার*। পরিচালক চেতন। দেব হিরো, নায়িকা সুরাইয়া। আমি সংগীত পরিচালক। ১৯৪৯ সাল। ছবিটি ভালো চলেনি। কিন্তু সুরাইয়ার গলায় আমার একটি সুর 'মন মেরা হুয়া মাতোয়ালা' খুবই জনপ্রিয় হলো।

নবকেতনের হয়ে আমার দ্বিতীয় ছবি করলাম ১৯৫০ সালে—ছবির নাম *বাজী*, পরিচালক ছিলেন গুরু দত্ত। দেব আনন্দ ও গীতাবলী প্রধান চরিত্রে। এ ছবি তোলার সময় আমি এবং গুরু সদাসর্বদা সংগীত সম্পর্কে আলাপ-আলোচনায় ডুবে থাকতাম। সে তার ছবির পরিচালনার বিভিন্ন আইডিয়া আমাকে শোনাত, আমিও গানের সংগীত রচনার বিষয় তার সঙ্গে আলোচনা করতাম। আমাদের দুজনের এই সহযোগিতা ছবিটির সাফল্যে সাহায্য করে। এখনকার হিন্দি চলচ্চিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকার শাহির লুধিয়ানভিকে আমিই প্রথম গান রচনার জন্য আহ্বান করি। *বাজী* ছবির গানগুলো তারই লেখা। যদিও লুধিয়ানভি তখন নতুন, তবুও নব কেতনের কর্তৃপক্ষ আমার এই নির্বাচনে কোনো আপত্তি করেনি। প্রথম থেকেই গতানুগতিক ছন্দের আমি বিপক্ষে। যেসব গীতিকারের সঙ্গে আমাকে কাজ করতে হয়, তাদের আমি আমার সুরের ছন্দ অনুযায়ী লিখিয়ে নিতে চেষ্টা করি। আমি শাহিরকে দিয়েও এভাবে গান লেখানোর চেষ্টা করলাম। দুজনকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছিল বহু সময় ব্যয় করে। কিন্তু আমাদের এই যুক্ত প্রচেষ্টা খুবই সাফল্যমণ্ডিত হলো। এ ধরনের বহু পরীক্ষা আমি করেছি আমার সংগীত রচনায়। কোনো কোনো সময় তা খুবই সফল হয়েছে, কোনো সময় আমি অকৃতকার্যও হয়েছি। আমার সংগীত পরিচালনায় নবকেতনের আরেকটি ছবি *কালাপানি*তে একটা গানের মুখড়াতে গজলের ছন্দ রেখে অন্তরা একেবারে গীতে সুর-সংযোজনা করেছিলাম। গানটির প্রথম লাইন ছিল 'হাম বেখুশিমে তুমকো পুকারে চলে গায়ে।' রফিকে দিয়ে গাইয়েছিলাম ওই গান। রফি আমার পরিকল্পনায় সুন্দর আমেজ দিয়ে গেয়ে ছিল গানটি, ঠিক যেমনটি চেয়েছিলাম।

নবকেতনে আমরা সবাই যেন একসূত্রে বাঁধা হয়ে গিয়েছিলাম। *বাজী* ছবিতে পরীক্ষা শুরু করলাম, শাহিরকে দিয়ে একখানা গজল লেখালাম।

এই গজলসুরের সঙ্গে পাশ্চাত্য সুর মিশ্রণ করলাম। পরিচালক গুরু বা নবকেতনের কেউ এর আপত্তি করল না। বরং নতুন ধরনে এই রচনার তারিফই করল। গানটির প্রথম লাইন 'তদবিরসে বিগড়ি হুই তকদির বানালে'। গীতা রায় এই গানটি করেছিল। ছবি প্রদর্শিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গানটি হিট হয়ে গেল। এই গানই প্রথম আমাকে সুর-সংযোজনার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠতা এনে দেয়। *বাজীর* প্রায় সব কটি গানই খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। গীতা রায় এই ছবিতে গান করে খুব নাম করেছিল। অবশ্য ফিল্মিস্তানের *দো ভাই* ছবিতে এর আগে 'মেরে সুন্দর স্বপ্না বিত গয়া' গানটিও গীতার কণ্ঠস্বরে গীত হয়েছিল, যা থেকে তার জনপ্রিয়তার সূত্রপাত। গীতা এর আগে কোরাসে গাইত। আমিই প্রথম একক গাইবার সুযোগ দিয়েছিলাম। *বাজী* ছবিতে নায়িকার সব গান গীতার গাওয়া।

এরপরে 'ফিল্ম আর্টস' নামের আরেকটি চলচ্চিত্র কোম্পানির হয়ে আমি সংগীত পরিচালনা করি ১৯৫১ সালে। ছবিটির নাম *জাল*, পরিচালক গুরু দত্ত। এখানেও সে নায়ক। এই ছবিতেও একেবারে আমার পছন্দমতো একটি গান রচনা করেছিলাম নায়কের জন্য। কাকে দিয়ে এই গানখানা গাওয়াব, সে কথা ভাবছিলাম। তখন প্রধান সব গাইয়ে রফি, তালাত, মুকেশ। কিন্তু ঠিক একই সময় হেমন্ত কুমার বম্বে এসেছিলেন ফিল্মিস্তানে চাকরি নিয়ে, কিন্তু তখনো চলচ্চিত্রে প্লে-ব্যাক করার কোনো সুযোগ পায়নি। স্থির করলাম এই গানটি হেমন্তকে দিয়েই গাওয়াব। হিন্দি উচ্চারণ স্পষ্ট করার জন্য হেমন্তকে খুব খাটতে বলেছিলাম তখন এবং অনেক অভ্যাসের পর হেমন্ত গানটি গাইল। এই একটি গানেই হেমন্ত হিন্দি ছবির জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। হিন্দি ছবিতে একটি নতুন গলা শুনে জনসাধারণও খুব খুশি হলো। এই গানটির প্রথম লাইন ছিল 'ইয়ে রাত ইয়ে চাঁদনি, ফির কাঁহা, শুন যা দিলকি দাসতা।' শাহিরকে সামনে বসিয়ে অনেক খেটে আমার সুর ও আইডিয়া অনুযায়ী এই গানটি লিখিয়েছিলাম। গীতা ও হেমন্তকে এভাবে আমি হিন্দি চলচ্চিত্রসংগীতে এনে জনপ্রিয় শিল্পী করতে পেরেছিলাম। আমারও নিজের ক্ষমতার ওপর তখন কিছুটা আত্মবিশ্বাস এসে গেল। যখনই কোনো গানের সুর দিতাম, তখন সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্থির করতাম, কার গলায় এই গান ভালো পরিবেশিত হবে।

নবকেতনের হয়ে *ট্যাক্সি ড্রাইভার* ছবির সংগীত রচনা করলাম (১৯৫৩), পরিচালক চেতন আনন্দ, নায়ক দেব। এই ছবিতে তালাত মহম্মদকে দিয়ে আমার একটি প্রিয় গান গাইয়েছিলাম। রফি, মুকেশ,

হেমন্ত তখন আমার সুর-সংযোজনায় গান করতে উৎসুক ছিল। কিন্তু ওই বিশেষ গানটি তালাতের কণ্ঠে ভালো হবে বলে মনে ছিল আমার দৃঢ় ধারণা। কারণ গানের সুরে ছিল ছোট ছোট হালকা মুড়কি। তালাতের গলার বিশেষত্ব ছিল হালকা খটকি, লক্ষ্ণৌ ঢঙে মার্জিত। তালাতকে দিয়ে গানটি গাওয়ালাম। সেই ছবির ওটাই হলো সব চেয়ে জনপ্রিয় গান। প্রথম লাইন 'যায়ে তো যায়ে কাঁহা'। এই ছবির সংগীত পরিচালনা করে সে বছর আমি বম্বের চলচ্চিত্র পত্রিকা *ফিল্মফেয়ার*-এর শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালকের পুরস্কারটি পাই।

৭

অশোককুমারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, খ্যাতনামা অভিনেতা কিশোরকুমারকেও আমিই প্রথম সংগীতশিল্পীরূপে আবিষ্কার করি এবং হিন্দি চলচ্চিত্রে গান করার সুযোগ দিই। আমি তখন ফিল্মিস্তানে কাজ করছি, দাদামণি অশোককুমারের নিজস্ব প্রোডাকশন *এইট ডেজ*-এ (১৯৪৬)। কিশোর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার পর তার দাদার ফিল্ম স্টুডিওতে বেড়াতে আসত। একদিন দাদামণি আমাকে কিশোরের গান শুনতে বললেন। কিশোর কোনো দিনও তেমনভাবে গানের অভ্যাস করেনি, রেওয়াজ করেনি—একেবারে স্বাভাবিক ভগবানদত্ত গলায় ওর গান শুনে আমি মুগ্ধ। তখনই আমি ওই ছবির একটি গান কিশোরকে দিয়ে গাওয়ালাম। প্রথম 'টেক'-এই একেবারে 'ওকে' করতে হলো। আমি তখন দাদামণিকে বলেছিলাম, কিশোরকে আর কলেজে পড়িয়ে কোনো দরকার নেই, এই গানের লাইনেই যেন সে চলে আসে। তারপর কিশোর হিন্দি ছবির প্লে-ব্যাক শিল্পীরূপে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করল। আমার এখনকার নতুন ছবি *আরাধনার* (১৯৬৯) বহু গান কিশোরের কণ্ঠে একেবারে এমন হিট হয়েছে যে বলার নয়।

কিশোরকে দিয়ে আমি কখনো গজল গাওয়াইনি। কারণ গজল ওর গলায় মানাবে না। ওর গলার উপযোগী হলো, Smart ও rythmic সুর। কিশোরকে দিয়ে আমি যেসব গান করিয়েছি, প্রত্যেকটিই খুব সাফল্য লাভ করেছে।

হিন্দি ছবিতে ব্যাকগ্রাউন্ড সংগীতের চেয়েও গানের সুরের ওপর বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়, কারণ সাধারণ দর্শক ও শ্রোতা গান বলতে অজ্ঞান।

কোনো ছবিতে যদি কোনো গান তাদের পছন্দমতো হয়ে যায়, তবে সেই ছবির সাফল্য নিশ্চিত। প্রযোজকেরা যখন ছবির পরিবেশকদের নিকট ছবি বিক্রি করতে যায়, তখন বহু ক্ষেত্রে তারা প্রথমেই ছবির গান শুনতে চায়। গান পছন্দ হলে বেশি দামে বিক্রিও হয়ে যায়। ছবির দামে এই বেচা-কেনার তারতম্য বহু ক্ষেত্রে গানের জন্য ঘটে। আমি নিজে ব্যাকগ্রাউন্ড সংগীতের গুরুত্ব দিলেও এবং তার প্রাধান্য সর্বাগ্রে মনে করলেও সাধারণ শ্রোতাদের তো আমি অবজ্ঞা করতে পারি না। আমাদের সুনাম বা বদনাম সর্বদাই এই গানের সুরের ওপর নির্ভর করে। সুতরাং গান ও তার সুর যাতে সাধারণ শ্রোতারা নেয়, সে প্রচেষ্টা আমাদের সবাইকেই করতে হয়।

আমার গানের সুর নিজের পছন্দমতো হলেও তার সাফল্য নির্ভর করে গায়ক-গায়িকার ওপর। ১৯৪৪ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত আমার সুরে যাঁরা গান গেয়েছেন, তাদের মধ্যে আছেন এই জনপ্রিয় শিল্পীরা—আমিরবাই কর্ণাটকি, সামসাদ বেগম, রাজকুমারী, লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, গীতা (রায়) দত্ত, সুরাইয়া, পারুল বিশ্বাস (পান্নালাল ঘোষের স্ত্রী), সুমন কল্যাণপুর, পরে (অভিনেত্রী) মুবারক বেগম, হেমলতা, সন্ধ্যা মুখার্জি প্রমুখ। সন্ধ্যাকে আমিই কলকাতা থেকে বম্বে এনেছিলাম একটি ছবিতে প্লে-ব্যাক করার জন্য। গায়কদের মধ্যে আমার ছবিতে গেয়েছেন, মহম্মদ রফি, মুকেশ, মান্না দে, হেমন্তকুমার, কিশোরকুমার, অশোককুমার, সুরেন্দ্র ও বাতিস। বাতিস এককালে সংগীত পরিচালক ছিলেন এবং ভালো উচ্চাঙ্গসংগীতের গলা ছিল তাঁর। ক্লাসিক্যাল ধরনের গান আমি বাতিসকে দিয়ে করিয়েছি আমার ছবিতে। সুরেন্দ্র হিন্দি ছবির নায়ক ছিলেন এবং নিজে গাইতেও পারতেন।

প্লে-ব্যাক শিল্পীদের মধ্যে লতা মঙ্গেশকর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাইকের এত উপযোগী গলা বোধ হয় আর কারও নেই। এমনকি অতীতেও ছিল না। ভবিষ্যতেও তা হবে কি না, সন্দেহ। সব রকম গান, নানা সুরের, নানা ধরনের ও মুডের লতার গলায় খাপ খেয়ে যায়। অত্যন্ত অনায়াসে লতা সব গান ও সুর তুলে নিতে পারে। এখনকার প্রাদেশিক মনোভাব ও ভেদাভেদের দিনেও ভারতের সব অঞ্চলে লতার জনপ্রিয়তা, বিভিন্ন ভাষায় গান সবার হৃদয় জয় করেছে। আমার বহু হিন্দি গানের সাফল্যের মূলে লতার গলা।

লতার বোন আশাও খুব উচ্চশ্রেণীর শিল্পী। ওর গলার মধ্যে বেশ একটা Youthful vigour-এর মেজাজ আছে। এই দুই বোন সুর নিয়ে কোনো

প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ওদের বুঝিয়ে দিলে অনায়াসে তা গলায় তুলে নিতে পারে।

চলচ্চিত্রের সংগীত রচনার সাফল্যের মূলে হলো অত্যন্ত সহজ ও সরল সুর দেওয়া, সাধারণ শ্রোতারা যাতে সহজে গানটি নিজের গলায় তুলতে পারে। ছবিতে হিট গান মানেই সোজা গান। আমার মতে, নানা রকম রং ফলিয়ে কেরামতি দেখিয়ে সুর-যোজনা করা অতি সহজ। কিন্তু অত্যন্ত সোজা-সরল সুর সবার প্রাণ স্পর্শ করবে, এমনকি শিশুও গাইতে পারবে, তা রচনা করাই সবচেয়ে দুরূহ।

তাই বলে আমি যে কঠিন ও জটিল সুর বা উচ্চাঙ্গসংগীতের ভিত্তিতে প্রয়োজনমতো সুরারোপ করিনি, তা নয়। এবং এসব গানের জন্য আমার সবচেয়ে প্রিয় শিল্পী হলো অনুজপ্রতিম শ্রীমান্না দে। কলকাতায় আমার গান শেখার সর্বপ্রথম গুরু স্বর্গত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দের ভ্রাতুষ্পুত্র। মান্না বহু দিন বম্বে আছে। আমি ১৯৪৮ সালে বম্বে টকিজের দ্বারা প্রযোজিত বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের *রজনী* অবলম্বনে বাংলা ও হিন্দি দুটি ছবির সংগীত পরিচালক ছিলাম। *রজনী*র বাংলা ছবির নাম রাখা হয়েছিল *সমর* ও হিন্দি ছবির *মশাল*। এ দুটি ছবির পরিচালক ছিলেন নীতিনদা। দুটোরই নায়ক অশোককুমার। সংগীত পরিচালকরূপে মান্না ছিল আমার সহকারী। বড় অমায়িক নিরহংকার ও মিষ্টভাষী এই মান্না। বম্বের হিন্দি ছবির গান আজকাল অনেকটা মেকানিক্যাল হয়ে গেছে, শিল্পীরা রোজই রেকর্ডিংয়ে ব্যস্ত, অভ্যাস বা রেওয়াজ করার সময় কোথায়। মান্না কিন্তু এর একমাত্র ব্যতিক্রম। জনপ্রিয়তা ও খ্যাতির শীর্ষে এখনো এই শিল্পী রোজ সকালে প্রিয় তানপুরা নিয়ে রেওয়াজ করে, পারতপক্ষে কখনো বাদ পড়ে না এই অভ্যাস। সংগীতের ওপর ওর এই নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা আমাকে মুগ্ধ করেছে। এ জন্য সে আমার অত্যন্ত স্নেহের পাত্র। মান্না আমার ছবিতে বহু গান করেছে ও এখনো করছে। সব গানেই সে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

উচ্চাঙ্গসংগীতের ভিত্তিতে কোনো গানের যখন সুর রচনা করি, তখন আমি তা মান্নার গলায় গাওয়ানো পছন্দ করি। যখনই ছবির গল্পের সিচুয়েশন অনুযায়ী উচ্চাঙ্গসংগীতের সুর রচনা করার সুযোগ পেয়েছি, তখনই আমি তা গ্রহণ করেছি। ১৯৬১ সালে *মেরি সুরৎ তেরি আঁখে* ছবির এ রকম এক ঘটনার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। বাংলা ছবি *রিক্তা*র ওপর ভিত্তি করে এই ছবি নির্মিত হয়েছিল ১৯৬১ সালে। জিপি ফিল্মসের প্রযোজক, পুরোনো দিনের অভিজ্ঞ পরিচালক শ্রীরাখান আর নায়ক শ্রীঅশোককুমার।

অশোককুমার নিজে আমাকে অনুরোধ করেন ছবির সংগীত পরিচালনার ভার নিতে। ছবিতে ছিল এক ক্লাসিক্যাল সংগীতশিল্পী ওস্তাদের চরিত্র। ওস্তাদ তার ছেলেকে একটি গানের তালিম দেয় বাল্যকালে। বড় হয়ে সেই ছেলে (অশোককুমার) বাবার তালিমের সেই গান গায়। সময় ছিল ভোর রাত্রি। আমি সময়োপযোগী আহিরি ভৈরব রাগে একটি গান রচনা করলাম, শৈলেন্দ্র গীতিকার। গানটি হলো 'পুছোনা কঁায়সে ম্যায়নে রয়ন বিতাই।' গানটি ছবিতে গেয়েছিল মান্না দে। মান্নার গলায় গানটি যে কী প্রাণবন্ত হয়েছিল, যাঁরা তা শুনেছেন, তাঁরাই উপলব্ধি করেছেন। গানটি মোটেই চটুল নয়, টিমালয়ে গম্ভীর প্রকৃতির। এখনো গানটির জনপ্রিয়তা বর্তমান, এমনই আমেজ ও শিল্পীজনোচিত মেজাজে মান্না গেয়েছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আরও বহুকাল এই গানটি সমাদৃত হবে রসিকদের নিকট।

৮

গান রচয়িতারূপে শাহির লুধিয়ানভিকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি। আমাদের দুজনের মধ্যে খুব একটা সমঝোতাও আছে। এ ছাড়া শ্রীপ্রদীপও আমার জন্য বহু গান লিখেছেন। হিন্দি চলচ্চিত্র জগতের প্রায় সব গীতিকারের সঙ্গেই আমি কাজ করেছি, যেমন নরেন্দ্র শর্মা, গোপাল সিং নেপালি, কমর জালালাবাদী, রাজামেহেদী আলী, রাজেন্দ্রকৃষ্ণ, মজরুহ সুলতানপুরী, কয়ফি আজমি, হসরৎ জয়পুরী, গুলজার, আনন্দ বকসী, নিরজ এবং শৈলেন্দ্র। এঁরা সবাই তাদের সুন্দর রচনায় আমার সুরের মর্যাদা দিয়েছেন এবং এঁদের সঙ্গে কাজ করে আমি খুবই আনন্দ পেয়েছি।

গীতিকার স্বর্গত শৈলেন্দ্রর কথা খুবই মনে পড়ে। তাকে হারিয়ে আমার সুর রচনায় যে ক্ষতি বোধ করছি, তা পূরণ হওয়ার নয়। বহু ছবিতে আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি। শৈলেন্দ্রর এক অসাধারণ গুণ ছিল, অত্যন্ত সরল ও সোজা ভাষায় গভীরতা এনে ভাব ফুটিয়ে তুলত। সাধারণ শ্রোতারা সহজে যা মনে রাখতে পারত, চটপট শিখে নেওয়াও সম্ভব হতো।

বম্বের চলচ্চিত্র জগতে একদিক দিয়ে আমি নিজেকে খুব ভাগ্যবান বলে মনে করছি। চিত্র পরিচালকদের প্রীতি, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা আমি পেয়েছি অকৃপণভাবে। চিত্র পরিচালকেরা সদাসর্বদা আমার সঙ্গে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, সে সহযোগিতা না পেলে আমার এখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভব হতো না। পরিচালক গুরু দত্ত আমাকে খুবই প্রীতি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখত। আমার পছন্দ নয়, এমন কিছু কোনো দিনও সে করতে বলেনি। দুজনের চিন্তাধারা এক হয়ে মিশে যেত। তার অকালমৃত্যু শুধু যে হিন্দি চলচ্চিত্র জগতের ক্ষতি করেছে তা নয়, আমাকেও যেন অনেকটা কঙাল করে গেছে।

বাজী ছবি থেকে শুরু করে *কাগজ-কা-ফুল* পর্যন্ত আমাদের দুজনের যে 'টিম-ওয়ার্ক' ছিল, তার অভাব আর কোনো দিনই পূর্ণ হবে না। কোনো নতুন সুর দিয়েছি, খবর পাওয়া মাত্র শুটিং বন্ধ করে চলে আসত আমার কাছে গান শুনতে। এই গান শুনে তখনই চিত্রনাট্য নিয়ে বসে যেত, গানের পরিস্থিতি তৈরি করত। এই সদা-বাহার উদাসী রসিক মানুষটির কথা যখনই মনে পড়ে, নিজেকে কেমন যেন নিঃসঙ্গ মনে হয়।

আমার বন্ধু দিকপাল পরিচালক শ্রীবিমল রায়ও আমাদের ছেড়ে আজ চলে গেছেন। অতি মধুর ও অমায়িক ব্যবহার ছিল বিমলদার। কলকাতায় নিউ থিয়েটারসের যুগ থেকেই তার সহিত আমার পরিচয় ও হৃদ্যতা। তার চারখানা ছবিতে (*দেবদাস, সুজাতা, বন্দিনী, বেনজির*) আমি সংগীত পরিচালনা করেছি এবং তাঁর সঙ্গে কাজ করে প্রচুর আনন্দ পেয়েছি। বিমলদা ছিলেন আমার গানের এক অন্ধ ভক্ত। পারতপক্ষে আমার গানের আসরে তিনি কখনো অনুপস্থিত থাকতেন না। বিমলদা অত বড় পরিচালক হয়েও গান সম্বন্ধে, ছবিতে গানের সিচুয়েশন সম্বন্ধে সর্বদা আমার রায় মেনে নিয়েছেন। কখনো আমাকে তাঁর কোনো মত অনুযায়ী কিছু করতে নির্দেশ দেননি। তাঁর আইডিয়া অনুযায়ী কোনো স্থানে গানের জন্য যদি আমি অমত জানিয়েছি, তিনি তা মেনে নিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ *সুজাতা* ছবির একটি গানের সিচুয়েশনের কথা উল্লেখ করছি। বেখাপ্পা মনে হলেও আমি প্রস্তাব করেছিলাম বিমলদাকে গান্ধী ঘাটের দৃশ্যের পর সুজাতা ঘরে ফিরে যায়। কিছুক্ষণ বাদে অধীর টেলিফোনে সুজাতাকে ডাকে এবং টেলিফোনে একখানা প্রেমসংগীত গায়। এই গান বেশ একটি নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল, ঠিক গানের জন্যই গান দেওয়া সে রকম হয়নি। শ্রোতারা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল এই গানের এবং আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। গানের প্রথম লাইন ছিল 'জ্বলতে হায় জিসকে লিয়ে'। তালাত গেয়েছিল গানটি।

আমি এখনো সংগীত পরিচালনা করে চলেছি। কিন্তু বিমলদা ও গুরু দত্তর আমার গানের প্রতি ভালোবাসা ও দরদের কথা সদাসর্বদা, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। তাঁদের প্রীতি আমার জীবনের অমূল্য সম্পদ।

১৯৫০ সালে 'ফিল্ম আর্টস'-এর *বুজদিল* নামের একটি ছবির সংগীত পরিচালনা করেছিলাম। শহীদ লতিফ পরিচালক ও গীতিকার শৈলেন্দ্র। ছবিতে 'ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ পায়েল বাজে' গানটির সুর রচনা সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। নটবেহাগ রাগের ওপর এ গানটি আগ্রা ঘরানার। ১৯৩৫ সালে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর কণ্ঠে এই গান শুনে মশগুল হয়ে গিয়েছিলাম। ছোট ছোট বোল,

তান ও ছন্দ সৃষ্টি করে খাঁ সাহেব এই গানে যে রসমাধুরী তুলে ধরেছিলেন, তা এখনো আমার কানে ভাসে। আমি এই গানে এমনই প্রেরণা পেয়েছিলাম যে কলকাতায় একটি বাংলা গানে এই সুরের সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলাম। *বুজদিল* ছবিতে এই গানটি ব্যবহার করলাম, একই প্রথম লাইন এবং লতাকে দিয়ে গানটি গাওয়ালাম। আগেই বলেছি, হিন্দি ফিল্মি-সংগীতে উচ্চাঙ্গসংগীতের সুরে গানকে জনপ্রিয় করা খুবই কঠিন। আমি অস্থায়ীতে গানটির উচ্চাঙ্গরাগ বজায় রেখে, অন্তরায় কীর্তনের রূপ দিতে চেষ্টা করলাম। এ গানখানা ক্লাসিক্যাল রাগ ও কীর্তনের সংমিশ্রণে সুর দিয়েছিলাম বলে জনসাধারণেরও ভালো লেগেছিল এবং গোঁড়াপন্থীদের প্রশংসা পেয়েছিলাম ক্লাসিক্যাল রাগ এভাবে জনপ্রিয় করাতে।

মেরি সুরৎ তেরি আঁখে ছবিতে এ ধরনের আরেক পরীক্ষা করেছিলাম। শৈলেন্দ্রর লেখা একটি গান ছিল, যার প্রথম লাইন 'নাচে মন মোরা মগন তিগদা ধিগি ধিগি'। এই গানের সুরের আইডিয়া এসেছিল এভাবে—কথক নাচের বিখ্যাত শিল্পী শ্রীবৃন্দাদীন মহারাজ তার ভ্রাতুষ্পুত্রদের নাচের তালিম দেওয়ার সময় মুখে 'তিগদা ধিগি ধিগি' এক নাচের বোল সব সময় বলতেন এবং এই বোল অনুযায়ী পায়ের কায়দা শেখাতেন। কলকাতার আচ্ছান মহারাজের সঙ্গে আমার খুব হৃদ্যতা ছিল এবং এই নাচের বোলটি আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল। শৈলেন্দ্রকে দিয়ে গানটি লেখাই আমার সুরের ওপর। আমি ওকে আইডিয়া দিলাম 'মনময়ূর নাচছে বা মন নাচছে' এ রকম কিছু প্রথম লাইন। সে লিখল, 'নাচে মন মোরা মগন', আমি তারপর বোল বসিয়ে দিলাম 'তিগদা ধিগি ধিগি'। ফুটিয়ে তোলার জন্য লয়ের কাজ দেখলাম সুরে। বেনারসের পণ্ডিত শান্তপ্রসাদ তবলা বাজিয়েছিলেন এই গানে। তাঁকে বিশেষভাবে আনা হয়, কথক নাচের বোলের সঙ্গে এই গানে তবলা বাজানোতে সবারই পছন্দ হয়েছিল আমার এই গান। এ রকম বিভিন্ন গানের সুর রচনায় এ ধরনের নানা ঘটনা বর্তমান।

নবকেতনের *জুয়েল থিফ* ছবিতে (১৯৬৬) এ রকম এক নতুন ধরনের সুর দেওয়ার প্রয়োজন ঘটেছিল। ছবির দুটি নায়িকা। তনুজা অন্যতম ভূমিকায়, উদ্দাম তার চরিত্র, চলাফেরা, কথাবার্তা সবই বেপরোয়া, চপলতায় ভরা। এর জন্য একটি বিশেষ গান রচনার নির্দেশ এল পরিচালক বিজয় আনন্দের নিকট থেকে। সাধারণত হিন্দি ছবির গানে প্রথমে অস্থায়ী, পরে অন্তরা আবার অস্থায়ীতে গান শেষ হয়। তনুজার জন্য সে রাস্তায় না গিয়ে আমি একটি গদ্যকবিতার জন্য সুর রচনা করলাম। সুরটি চেয়েছিলাম চরিত্রানুযায়ী

করতে। গানের দৃশ্য—এই দুরন্ত নায়িকা নায়কের নিকট গান করছে, প্রথম লাইন 'রাত একেলি হ্যায়, বুঝ গায়ে দিয়ে, আকে মেরে পাশ, কানোমে মেরে—যোভি চাহে কহিয়ে'। বাংলাতে হলো 'রাত্রি একেলা, দীপ নিবে গেছে, এস কাছে মোর, শুধু কানে কানে, যাহা খুশি বল বল বল'।

আমি সুর দিলাম। নায়িকা প্রথম কথা কটি Croon করবে। তারপর হঠাৎ শেষ লাইন 'যোভি চাহে কহিয়ে' নাটকীয়ভাবে চেঁচিয়ে ওপরের সুরে গাইবে। প্রথম লাইন গাওয়ার পর মিউজিক, অন্তরা গদ্যকবিতায়। আশা ভোঁসলে গেয়েছিল গানটি। খুব সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল আমার এই প্রচেষ্টা। সুলতানপুরী গান লেখেন, আর তনুজা অভিনয়ে সেই আইডিয়া প্রাণবন্ত করেন।

আমার এই সামান্য জীবন গানে গানেই কেটেছে। জন্মানোর পর বাবার স্নেহে, সুরে দীক্ষিত হয়ে আনোয়ার আর মাধবের স্নেহের ছায়ার, তাদের সরল গ্রাম্যসংগীতের রস গ্রহণ করে, বহু গুণী গায়কের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে সংগীত সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছি। আমার জীবনে ভারতের বহু গুণী-জ্ঞানী, সংগীতপ্রেমী ও কলাকারদের সংস্পর্শে এসেছি। এঁদের প্রীতি, ভালোবাসা পেয়ে ধন্য হয়েছি। এ ছাড়া তিনবার পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণ করে সেসব দেশের বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ও শিল্পীদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। তাঁদের গান শুনেছি আর শুনিয়েছি তাঁদের আমার সংগীতশৈলী। তাঁদের সংগীত পদ্ধতির ধারার সঙ্গে সমাবেশ ঘটেছে আমাদের সংগীতের। দুই সংগীতধারা বিনিময় ঘটেছে। আমার মন এখন আর এসব ছুটোছুটি চায় না। মন চায় নিভৃতে সুর সৃষ্টি করে যেতে, সুরে সুরে ডুবে থাকতে আর শ্রোতাদের আনন্দ দিতে।

হিন্দি চলচ্চিত্র সংগীতের সুর রচনায় আমি সর্বদাই চেয়েছি নতুন কিছু দিতে, যাতে অন্য সংগীত পরিচালকদের থেকে নিজে একটি পৃথক শৈলীর উদ্ভাবক বলে পরিচিত হতে পারি। প্রথম দিকে এটিই ছিল আমার উদ্দেশ্য এবং এখনো এই নীতি সফল করার প্রচেষ্টায়ই নিজেকে নিয়োজিত রেখেছি। কোনো সময় সাফল্য অর্জন করলে কী আনন্দই না পেয়েছি, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। অর্থ দিয়েও সে আনন্দ পূরণ হবে না। সুকুমার কলার ক্ষেত্রে প্রত্যেক শিল্পীকে নিজস্ব সত্তায় প্রকাশিত করতে হবে, নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট হতে হবে। অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র নন্দলাল। কিন্তু নন্দলাল নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে, নিজস্ব পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন নিজেকে। আগ্রা ঘরানার ফৈয়াজ খাঁ। কিন্তু তবুও কত রকম নিজস্ব শিল্পমানসের পরিচয় দিতেন তিনি, যা তাঁর

ঘরানার মধ্যে পাওয়া যাবে না। তাঁর জয়জয়ন্তী রাগে 'মন মন্দির মে আ' একান্তভাবে ফৈয়াজ খাঁর সৃষ্টি। কিরানা ঘরানার ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ। ঘরানার বাইরে কত নতুন কিছু সৃষ্টি করেছেন তিনি নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে। আমিও আমার ক্ষেত্রে চেয়েছি এই ধরনের নতুন কিছু করতে। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্পে কিছু করতে না পেরে মনে অভিমান ও ব্যথা নিয়ে ১৯৪৪ সালে বম্বে চলে এসেছিলাম, এখন আর সে অভিমান নেই। এখন নিজের শুধু এই পরিচয় যে আমি বাংলা মায়ের সন্তান এবং আমার সুরসৃষ্টি সমগ্র ভারতবাসীর সম্পদ, আমার সুর ভারতবর্ষের প্রতীক।

খতিয়ে দেখলে আমার এ জীবনকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। শৈশব ও কৈশোরের দুরন্তপনা গোমতী নদীর তীরে, কুমিল্লায়। যৌবনের উন্মত্ততা ভাগীরথীর স্পর্শে কলকাতায়, যা জীবনে প্লাবন এনে দিয়েছিল এবং প্রৌঢ়ত্বের ছোঁয়া দিল আরব সাগর, এই বোম্বাইয়ে।

ক্রমশ জলের ধারা এবং তার সান্নিধ্যে এই জীবনের ধারা স্ফীত ও গভীর হয়ে যাচ্ছে। যে শীর্ণা গোমতীর ধারার ছোঁয়ায় জীবন আরম্ভ হয়েছিল, যে তখন তরুণ মনে শুধু দৌরাত্ম্যের ইন্ধন জোগাত, সে জলাধারাটিই স্ফীত হয়ে ভাগীরথী রূপে যৌবনে উদ্দামতা ও চঞ্চলতা জাগিয়ে ছিল; এখন সে জলাধারাই স্থির, ধীর আরব সাগররূপে এ জীবনকে গম্ভীর ও গভীর করে তুলেছে।

এই তো আমার জীবনের তিনটি পর্ব।

জীবনের সায়াহ্নে আমার শুধু কামনা—আমি আর কিছু এখন আর চাই না। শুধু চাই, সরগমের নিখাদ হয়ে তলানিতে পড়ে থাকতে।

পরিশিষ্ট

শচীনকর্তার জীবনের শেষ পর্ব

দেশ পত্রিকায় শচীন দেববর্মনের অসমাপ্ত আত্মকথার শেষ কিস্তি প্রকাশ পায় ২১ চৈত্র ১৩৭৬ (৪ এপ্রিল ১৯৭০)। এতে তিনি মোটামুটি ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত স্মৃতিকথাকে টেনেছেন। 'সরগমের নিখাদ' প্রকাশের পরও তিনি সাড়ে পাঁচ বছর বেঁচে ছিলেন। জীবনের সায়াহ্নবেলা, যাকে বলা যায়, এই সময়কালেও তিনি সক্রিয় ছিলেন চলচ্চিত্রের সংগীত পরিচালনায়। এই কয় বছরের কথা আমরা এখানে সংক্ষেপে পেশ করব :

১৯৬৯ সালে শক্তি সামন্তের *আরাধনা* ছবিতে সংগীত পরিচালনা এবং সেই সঙ্গে কণ্ঠও দেন। এই সালেই তিনি *জ্যোতি* ও *তালাশ* নামের আরও দুটি হিন্দি ছবির সংগীত পরিচালনা করেন। ১৯৬৯ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত করে। ১৯৭০ সালে *ইসক পর জোর নেঁহি* ও *প্রেমপূজারী* এই দুটি ছবিতে সুর-যোজনা করেন। ১৯৭১-এর *গ্যাম্বলার, নয়া জমানা, শর্মিলী, তেরে মেরে স্বপ্নে*, ১৯৭২-এ *অনুরাগ, ইয়ে গুলিস্তাঁ হামারা, জিন্দেগী জিন্দেগী*রও সংগীত পরিচালক ছিলেন তিনি। *জিন্দেগী জিন্দেগী* ছবিতে শচীন দেববর্মন 'জিন্দেগী ইয়ে জিন্দেগী' এবং 'পিয়া তুনে ক্যায়া কিয়ারে' দুটি গানও গেয়েছেন। এই ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালকের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন। *অভিমান, ছুপা রুস্তম, জুগনু, ফাগুন* ১৯৭৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি, যাতে তিনি সুর সৃষ্টি করেন। *অভিমান* ছবির জন্য 'ফিল্ম ফেয়ার' পুরস্কার পান। তাঁর ১৯৭৪-এর ছবির নাম *প্রেমনগর, উসপার* ও *সাগিনা*। ১৯৭৫-এ *চুপকে চুপকে* ও *মিলি* ছবির সংগীত পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। তবে *মিলি* ছবির কাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। পরে পুত্র রাহুল দেববর্মনের ওপর এর কাজ শেষ করার দায়িত্ব বর্তায়। শচীনকর্তার

মৃত্যুর পর ১৯৭৬-এ তাঁর সুরারোপিত ছবি *অর্জুন পণ্ডিত*, *বারুদ*, *দিওয়াঙ্গি* ও *ত্যাগ*—এই চারটি ছবি মুক্তি পায়। তাঁর সুর করা হিন্দি ফিল্মের যেসব গান লোকের মুখে মুখে ফিরত, তার তালিকা কম দীর্ঘ নয়। দীর্ঘ ২৫ বছর পর *চৈতালী* নামের শেষ বাংলা ছবির সংগীত পরিচালনা করেন ১৯৭১-এ। তবে মন্দভাগ্য, *চৈতালী*তেও শচীনকর্তা সংগীত পরিচালক হিসেবে সফল হতে পারেননি।

বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক হৃষীকেশ মুখার্জির *মিলি* ছবির সংগীত পরিচালক ছিলেন শচীন দেববর্মন। গীত রচনা করেছিলেন যোগেশ। গান গেয়েছিলেন কিশোরকুমার ও লতা মঙ্গেশকর। ১৯৭৫-এর মে মাসের দিকে স্টুডিওতে এই *মিলি* ছবির গান রেকর্ডিংয়ের সময় শচীনকর্তা হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর আচ্ছন্ন অবস্থায় জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে কাটে তাঁর কয়েক মাস। তাঁর জীবনের শেষ পর্বের দিনগুলোর কথায় জানা যায় : *মিলি*র রেকর্ডিং চলাকালে প্যারালিটিক স্ট্রোক হয় শচীন দেববর্মনের। রেকর্ডিং শেষ করার দায়িত্ব নেন রাহুল। কিশোর কুমার যখন গাইছেন 'বড়ি সুনি সুনি হ্যায়', শচীনকর্তা তখন গভীর কোমায়। শুধু পঞ্চম (রাহুল দেববর্মন) নন, স্টুডিওর সবাই কাজ করবে কি, কান্না চাপতে ব্যস্ত। তার পরও বেঁচেছিলেন পাঁচ মাস। কোমায় আচ্ছন্ন শচীন দেবকে জাগাতে স্ত্রী মীরা ও পুত্র রাহুলের কত কাতরোক্তি। দুজনে মিলে প্রতিদিন তাঁকে শোনাতেন ত্রিপুরার গল্প, কুমিল্লার কথা, কলকাতার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের নাম, হাজার হাজার টুকরো স্মৃতিকথা। একবারই নাকি চোখ একটু মেলেছিলেন শচীনকর্তা। ইস্টবেঙ্গল যেদিন মোহনবাগকে হারিয়ে দিল, সেদিন রাহুল চিৎকার করে খবরটা শুনিয়েছিলেন বাবাকে। ইস্টবেঙ্গলের কট্টর সমর্থক, কাঠ বাঙাল রাজকুমার শেষবারের মতো চোখ মেলেন। আর চোখ মেলেননি। ১৯৭৫ সালের ৩১ অক্টোবর গানের রাজপুত্র, রাজ-রাজেশ্বর শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমারবাহাদুর শচীন্দ্রচন্দ্র দেববর্মন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (*শচীনকর্তার গানের ভুবন*, খগেশ দেববর্মন)। এভাবে বাংলা ও হিন্দি গানের এক অসামান্য শিল্পী ও সুরস্রষ্টার জীবনের অবসান হলো ৬০ বছর বয়সে বাংলা মুলুক থেকে বহু দূরে বোম্বাইয়ে। শেষ হলো ধ্রুপদি শচীন যুগের। শারীরিকভাবে শচীনকর্তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হলেও রয়ে গেল তাঁর গান, যার আবেদন এখনো অক্ষুণ্ন, সেই সুরের মূর্ছনা ছড়িয়ে পড়বে কাল থেকে কালান্তরে।

শচীনকর্তার মৃত্যুতে সংগীত ও চলচ্চিত্র জগতের অনেকেই শোক প্রকাশ করেছিলেন, তাঁকে স্মরণ করেন শ্রদ্ধায়-প্রীতিতে। তার আগেও তাঁর কৃতি-

কীর্তি সম্পর্কে অনেকে মন্তব্য করেছেন। এদের মধ্যে তাঁর সংগীতগুরু ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজকুমার মল্লিক, মান্না দে, আশা ভোঁসলে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, রাজ্যেশ্বর মিত্র, সুরেশ চক্রবর্তী, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোককুমার, দেব আনন্দসহ আরও অনেকের নাম করতে হয়। এদের স্মৃতিচারণের ভেতর দিয়ে শচীনকর্তার কৃতি, বৈশিষ্ট্য ও সিদ্ধির অন্তরঙ্গ পরিচয় মেলে। আশা ভোঁসলের মন্তব্য দিয়ে শেষ করি বাংলা ও হিন্দিগানের কালজয়ী শিল্পী ও সুরস্রষ্টা শচীনকর্তার স্মরণ-কথা: 'আর কোনো দিনও দাদা (শচীন দেববর্মন) আমাকে গান শেখাবেন না—এ কথাটা যেন মন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না। কিন্তু তবুও এটা সত্য, ধ্রুব সত্য, তিনি নেই। আজ শুধু একটাই সান্ত্বনা, তিনি যে সুরের ভান্ডার উজাড় করে দিয়েছেন, তা মৃত্যুহীন। কোনো দিনও স্তব্ধ হবে না সেই সুরস্পন্দন।'

সরগমের নিখাদ

আলোচনা

[চিঠিপত্র]

॥ ১ ॥

শ্রীশচীন দেববর্মণের আত্মকথা 'সরগমের নিখাদ' প্রকাশ করার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। রচনার মুখবন্ধ হিসাবে যে অন্তরঙ্গ আলোচনা শ্রীসলিল ঘোষ করেছেন সেটি তথ্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ নয়। অবশ্য এটা শ্রীবর্মণের স্মৃতিবিভ্রমের জন্যও হতে পারে। শ্রীদেববর্মণ এক জায়গায় বলছেন, যতটুকু স্মরণ আছে, বাংলা ফিল্মে নয়টি ও হিন্দী ছবিতে সাতখানা মোট ষোলটি গান আমি আজ পর্যন্ত করেছি। হিন্দী ছবির তালিকাটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের, তাই মনে হয়, তালিকাটি সঠিক। বাংলা ফিল্মের নাম করেছেন চারটি। মধু বসুর 'সেলিমা' আর একটি চিত্রে (?) ওরে সুজন নাইয়া, 'নন্দিনী' আর 'অভয়ের বিয়ে'। শ্রীদেববর্মণের কথা অনুসারে বাকি থাকে পাঁচটি। আমার এছাড়া কতকগুলি গানের কথা মনে পড়ছে— সেগুলি এই প্রসঙ্গে জানাই। 'ছদ্মবেশী' ছবিতে 'বন্দর ছাড়ো যাত্রীরা সবে', 'জনম দুখিনী সীতা' (সম্ভবত ভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের 'গৃহলক্ষ্মী') আর একটি অপূর্ব গান বোধহয় শিল্পী গেয়েছিলেন 'প্রতিশোধ' ছবিতে— 'কী মায়া লাগল চোখে সকালবেলায়'। আমার তালিকা সঠিক হলেও শিল্পীর কথামত বাকি থাকে আর দুটি— সে দুটি কি?

শ্রীসলিল ঘোষ শিল্পবিচারের জন্য শার্ঙ্গদেবের একটি উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন— উদ্ধৃতিটি শ্রীদেববর্মণের সৃষ্টির স্বরূপ নির্ধারণে নিশ্চয়ই যথাযোগ্য

বিচার। কিন্তু আরও কিছু আছে যার জন্য এই সময়োপযোগী প্রকাশনার কৃতিত্ব আপনারা দাবি করতে পারেন। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ-অতুলপ্রসাদ-দ্বিজেন্দ্রলাল-নজরুলের পরে এবং এদের সৃষ্টির শেষ পর্বে শ্রীদেববর্মণের প্রতিভার স্ফূর্তি। আরও উল্লেখযোগ্য— এই সৃষ্টি যৌথভাবেই স্বকীয়তার পরিচয় দেয়। পরবর্তীকালে কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া এই যৌথ সৃষ্টি চলে আসছে অর্থাৎ গীতিকার ও সুরকার ভিন্ন ব্যক্তি— কিন্তু সার্থকতার ছাপ এখনও খুব সামান্য। এই আলোচনায় এই সমস্যার মূলে কিছু সূত্র পাওয়া যাবে— যাতে এই সমস্যা সাফল্যের অন্তরায় না হয় তার শিক্ষা পাওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, শ্রীদেববর্মণ এখনও প্রচণ্ডভাবে সৃষ্টিশীল। আরও বিস্ময়কর তাৎপর্য হল, ৬৩ বছর বয়সেও যিনি 'বাঁশি শুনে আর কাজ নাই', 'ও জানি ভোমরা কেন' অথবা 'ঘুম ভুলেছি নিঝুম এ নিশীথে' সৃষ্টি করতে পারেন— তাতেই বোঝা যায়— "স্বর্গসভার মহাঙ্গন" থেকে 'মাঝে মাঝে রঙীন ফুলের আলিম্পন' তাঁকে বিচলিত করে বেশী। তাই তাঁর কাছে আমাদের আশাও বেশী।

দেশ: ৯ ফাল্গুন ১৩৭৬

দেবাশিস দাশগুপ্ত
কলিকাতা-৩৩

॥ ২ ॥

আমাদের অন্যতম প্রিয় সুরকার ও গীতশিল্পী কুমার শচীন দেববর্মণের আত্মজীবনীমূলক স্মৃতিচারণ অতি আনন্দের সঙ্গে পড়ছি। এই প্রসঙ্গে ২১ ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় শ্রীদেবাশিস দাস [দাশগুপ্ত] ছায়াচিত্রে গীত শ্রীদেববর্মণের গানগুলি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন বাংলা ছবিতে গীত তার নয়খানি গানের মধ্যে সাতখানির হিসাব পাওয়া যাচ্ছে— যে দুটি বাঁকি থাকছে সে দুটি কি?

আমার যতদূর মনে পড়ছে, সে দুটি গান হচ্ছে— "মরণ তোদের ডাকে আজ" ও "সাজে নওলকিশোর চাঁদের তিলকে আজ"। তবে যে ছবি দুটি[তে] শ্রীদেববর্মণ এই গান দুখানি গেয়েছিলেন সে দুটির নাম এতদিন পরে কিছুতেই মনে আনতে পারছি না। স্মৃতির উপর নির্ভর করে এটুকু বললাম। হয়তো গানের পঙ্‌ক্তিগুলোর উদ্ধৃতিতে ত্রুটি থাকতে পারে। যদি থাকে, কোনও সহৃদয় পাঠক সংশোধন করে দিলে কৃতজ্ঞ হব।

দেশ : ২৩ ফাল্গুন ১৩৭৬

দিলীপকুমার বিশ্বাস
কলিকাতা-৩৭

॥ ৩ ॥

'সরগমের নিখাদ'— শ্রীশচীন দেববর্মণের আত্মকথার ভূমিকায় বলা হয়েছে, বাংলা ফিল্মে তাঁর গাওয়া গানের সংখ্যা মোট নয়টি। প্রসঙ্গক্রমে চারখানি বাংলা ছবির নামও উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী ৯ ফাল্গুনের দেশ পত্রিকায় পত্রলেখক দেবাশিস দাশগুপ্ত শ্রীদেববর্মণের গাওয়া আরও তিনখানি চিত্রগীতির উল্লেখ করে ('জনমদুখিনী সীতা' গানটি "জীবনসঙ্গিনী" ছবিতে ছিল) তালিকাটিকে অধিকতর সম্পূর্ণ করেছেন। শিল্পীর কথামত বাকি থাকে আরও দুটি গান। সম্ভবত সে দুটি গান হল, ১। অবোধ নেয়ে উজান বেয়ে যাও (প্রতিশোধ) এবং ২। বাংলার মেয়ে বাংলার তুমি (জীবনসঙ্গিনী? নারী?)

শচীনকর্তা একখানি ছবিতে রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছিলেন সে কথা তাঁর অনুরাগীদের নিশ্চয় স্মরণে আছে। গানটি হল 'মিলন রাতি পোহাল'। ছবির নামটি ঠিক মনে পড়ছে না, তবে সেই ছবিতেই প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত সেই বিখ্যাত গানটিও ছিল যার প্রথম লাইন, 'যদিও পরীরা ভুলেও কখনো এখানে আসে না নামি'।

দেশ : ২৩ ফাল্গুন ১৩৭৬

গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-১৪

॥ ৪ ॥

'সরগমের নিখাদ' নিঃসন্দেহে দেশ পত্রিকায় একটি মূল্যবান সংযোজন। আত্মজীবনীমূলক রচনা— যা অনেক দিন থেকেই দেশ-এ অনুপস্থিত ছিল, বিশেষ করে শ্রীশচীন দেববর্মণের মতো একজন মরমী শিল্পীকে কাছে পাওয়ায় একজন পাঠক হিসেবে সত্যি আমি আনন্দিত।

এই প্রসঙ্গে সবিনয়ে একটি কথা জানাতে চাই। গত ১৭ সংখ্যা দেশে প্রকাশিত— "১৯২৩ সালে বিএ ভর্তি হলাম... ১৯২৪ সালে বি এ পাশ করলাম..." শ্রীদেববর্মণের এই উক্তিতে আমাদের কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। আমরা যতদূর জানি, তখনকার দিনে আই এ পাশ করে বি এ ডিগ্রীর জন্যে কমপক্ষে দু'বছর পড়তে হতো। এটা কী তাহলে "ছাপাখানার ভূতের কারসাজি"।

দেশ : ৩০ ফাল্গুন ১৩৭৬

মন্মথ সাহা
গৌহাটী-১৬

॥ ৫ ॥

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী 'দেশ' পত্রিকার আলোচনা-বিভাগে প্রকাশিত শ্রীদেবাশিস দাশগুপ্তের চিঠিখানি পড়লাম। 'সরগমের নিখাদ'-শীর্ষক শ্রীশচীন দেববর্মণের স্মৃতিকথায় উল্লেখিত প্রসঙ্গে বাংলা ছায়াছবিতে শ্রীবর্মণের স্বকণ্ঠে গীত গানের সংখ্যা নিরূপণে শ্রীদাশগুপ্ত দুটি গানের মীমাংসা করতে পারেন নি বলে জানিয়েছেন। এর মধ্যে একটি গানের সূত্র তিনি আমার এই চিঠি মারফৎ পেতে পারেন আশা করি।

যতদূর মনে পড়ছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' অবলম্বনে গৃহীত বম্বে টকীজের 'সমর' কথাচিত্রে শ্রীদেববর্মণের স্বকণ্ঠে গীত একটি গান ছিল, যার প্রথম ক'টি কথা ছিল এই রকম :

"সুন্দরী লো, সুন্দরী,
দল বেঁধে আয় গান করি,
আজ বাদে কাল যদি মরি
আর না দাগা দিস...
ইত্যাদি, ইত্যাদি"।

কৈশোরও নয়, নিতান্ত বাল্য বয়সে দেখা উক্ত বাণীচিত্রের এই গানখানির সুর ও স্বর স্মৃতিতে আজও অম্লান। স্মৃতি যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করে, গানটি শ্রীদেববর্মণেরই স্বকণ্ঠে গীত ব'লে আমার বিশ্বাস।

দেশ : ২৩ ফাল্গুন ১৩৭৬

মিহিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
কলি-৩১

॥ ৬ ॥

শ্রীশচীনদেব বর্মণের চলচ্চিত্রে গান করা সম্বন্ধে শ্রীদেবাশিস দাশগুপ্তের চিঠি (দেশ-২১/২/৭০) পড়লাম। শচীনকর্তার জীবন সম্বন্ধে সঙ্গীত-রসিক পাঠক ও তার অনুরাগীরা এর মধ্যেই আমার নিকট নানা তথ্য পাঠিয়েছেন এবং প্রচুর কৌতূহল প্রকাশ করেছেন— যাতে খুবই আনন্দ বোধ করছি। বিভিন্ন তথ্যদানকালে শ্রীদেববর্মণের স্মৃতিবিভ্রম ঘটা অসম্ভব নয়। এ সম্পর্কে শান্তিনিকেতন থেকে বন্ধুবর শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় যে সব তথ্য পাঠিয়েছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে শচীনদা শুধু ৯টি কেন, ১৩টি গান গেয়েছিলেন ১০টি বাংলা

চলচ্চিত্রে। সেগুলি হল : ১৯৩৫ সনে মধু বসু পরিচালিত "সেলিমা" চিত্রে ভিখারীর কণ্ঠে, ভিখারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ১টি গান গেয়েছিলেন; ১৯৪০ সনে সুকুমার দাশগুপ্ত পরিচালিত "রাজকুমারের নির্বাসন" চিত্রে ১টি গান (বাঁশুরিয়া রে কোথায় শিখেছো বাঁশি বাজান্); ১৯৪১ সনে সুশীল মজুমদার পরিচালিত "প্রতিশোধ" চিত্রে ২টি গান (কি মায়া লাগল চোখে এবং অবোধ নেয়ে উজান বাইয়া যাও); সুকুমার দাশগুপ্ত পরিচালিত "এপার ওপার" চিত্রে ১টি গান (উদাসী রে বিদেশী রে ফিরে তুমি যাও); এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত "নন্দিনী" চিত্রে ১টি গান (চোখ গেল চোখ গেল কেন ডাকিস রে); ১৯৪২ সনে প্রফুল্ল রায় পরিচালিত "নারী" চিত্রে ১টি গান (কে যেন কাঁদিছে আকাশ ভুবনময়); গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত "জীবনসঙ্গিনী" চিত্রে ২টি গান (বাংলার মেয়ে বাংলার তুমি ও জনমদুখিনী সীতা) এবং সুশীল মজুমদার পরিচালিত "অভয়ের বিয়ে" চিত্রে ফকিরের কণ্ঠে, ফকিরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ১টি উর্দু গান (আয়ে দিল বেতর উসে ইয়াদ কিয়ে যা); ১৯৪৪ সনে হরি ভঞ্জ পরিচালিত "মাটির ঘর" চিত্রে ২টি গান (শ্যামরূপ ধরিয়া এসেছে মরণ ও কাল সাগরের মরণ দোলায়) এবং অজয় ভট্টাচার্য পরিচালিত "ছদ্মবেশী" চিত্রে ১টি গান (বন্দর ছাড় যাত্রীরা সবে)।

উপযুক্ত হিসাব অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, শচীনদা ১০টি বাংলা চলচ্চিত্রে ১৩টি গান গেয়েছিলেন।

এছাড়া সুখময়বাবু আরও জানিয়েছেন যে, শচীনদা ৫টি বাংলা ছবিতে সুরারোপ করেছিলেন (যদিও তিনি— সে যুগে বাংলা ছবিতে তাঁকে কেউ সঙ্গীত পরিচালনার ভার দেয় নি বলে আমার নিকট আগে অভিমান প্রকাশ করেছিলেন)। সেই ছবিগুলি হল : 'প্রতিশোধ', 'অভয়ের বিয়ে', 'ছদ্মবেশী', 'মাটির ঘর' ও 'প্রতিকার' (পরিচালক ছবি বিশ্বাস)। কারো কারো মতে 'রাজকুমারের নির্বাসন' ছবিরও সঙ্গীত পরিচালনা করেন শচীনদা। এটা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

এছাড়া শীচনদেব বর্মণ বলেছেন, "নন্দিনী" চিত্রে কাজী নজরুলের সুরে 'চোখ গেল চোখ গেল' গানটি ছাড়া অন্য কারো সুরে তিনি কখনো চলচ্চিত্রে গান করেন নি। কিন্তু "জীবনসঙ্গিনী" চিত্রে দুটি গান তিনি গেয়েছিলেন (বাংলার মেয়ে ও জনমদুখিনী সীতা), তার সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন শ্রীহিমাংশু দত্ত সুরসাগর, ওই গান দুটির সুর বোধ হয় তাঁরই দেওয়া। শচীনকর্তা হিমাংশু দত্তর সুরে অনেক গানই গেয়েছেন, চলচ্চিত্রের বাইরে।

আরও একটা কথা শচীনকর্তা বলেছেন, তাঁর কোন গান অন্য অভিনেতার মুখে প্লে-ব্যাক হয় নি। কিন্তু "রাজকুমারের নির্বাসন" ছবির 'বাঁশুরিয়া রে' ও "জীবনসঙ্গিনীর"র 'জনমদুখিনী সীতা' প্লে-ব্যাক হয়েছিল। কলকাতায় শচীন দেববর্মণ সুর-সংযোজিত শেষ ছবি "প্রতিকার" (১৯৪৪)। বোম্বাইয়ে তাঁর সুরে সংযোজিত প্রথম ছবি "বেগম" (পরিচালনা সুশীল মজুমদার)। শচীনদার মতে, ফিল্মিস্তানের হিন্দী ছবি "শিকারী"-তেই বম্বেতে তাঁর প্রথম সঙ্গীত পরিচালনা।

হিন্দী ছবিতে শচীনদা স্বকণ্ঠে যে গানগুলি গেয়েছেন সেগুলি হল: ১৯৪৬ সনে ফিল্মিস্তানের "আটদিন" (Eight Days) ছবিতে 'উমীদ ভরা পঞ্ছি থা খোঁজ রহা সজনী'; বিমল রায়ের "সুজাতা" (১৯৫৬) ছবিতে 'সুনো মেরে বন্ধু রে' ও "বন্দিনী" (১৯৬০) ছবিতে 'মেরে সজন হ্যায় উসপার'; নবকেতনের "গাইড" (১৯৬৩) ছবিতে 'ওহী কৌন হায় তেরা মুসাফির'; শক্তি ফিল্মসের "আরাধনা" (১৯৬৯) ছবিতে 'কাহেকো রোয়ে— সফল হোগি তেরা আরাধনা"; রালহান প্রোডাকশনের "তালাশ" (১৯৬৯) ছবিতে 'মেরী দুনিয়া হ্যায় মা তেরী আঁচলমে' এবং নবকেতনের "প্রেমপূজারী" (১৯৭০) ছবিতে 'প্রেম কে পূজারী হ্যায় ম্যয় রস কে ভিখারী'।

এ বিষয়ে পাঠকরা আরও সব তথ্য জানালে বাধিত হব।

দেশ: ৩০ ফাল্গুন ১৩৭৬

সলিল ঘোষ
বোম্বাই-১৪

॥ ৭ ॥

প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত শচীনদেব বর্মণ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সলিল ঘোষ মহোদয়কে আমি কিছু তথ্য পাঠিয়েছিলাম ১৪/৩/৭০ তারিখের 'দেশ'-এ প্রকাশিত পত্রে সলিলদা সেগুলি উল্লেখ করেছেন। শচীন দেববর্মণ যাতে সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন ও গান গেয়েছিলেন, এমন একটি বাংলা ছবির নাম সলিলদাকে জানাতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম ছবিটির নাম 'রাজগী'। এই ছবিতে শচীনবাবু দুটি গান গেয়েছিলেন— (১) সাজে নওলকিশোর ও (২) ওরে বন্ধুরে মনের কথা কইবার। 'রাজকুমারের নির্বাসন' ছবির সংগীত পরিচালকও শচীনবাবুই। 'রাজগী' ও 'রাজকুমারের নির্বাসন'কে নিয়ে শচীন দেববর্মণ কর্তৃক সুর-সংযোজিত কলকাতায় তোলা

বাংলা ছবির সংখ্যা দাঁড়ালো সাত। শচীনবাবু বোম্বাইতে তোলা দুটি বাংলা ছবির সুর সংযোজনা করেছিলেন— (১) বম্বে[ম্ব] টকীজের 'সময়' ও (২) গুরু দত্ত ফিল্মসের গৌরী (অসম্পূর্ণ)।

সলিলদা তাঁর চিঠিতে ফিল্মিস্তানের 'আটদিন' ছবিতে গাওয়া শচীন দেববর্মণের একটি মাত্র গানের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ঐ ছবিতে শচীনবাবুর একাধিক গান ছিল।

২৮/২/৭০ তারিখের 'দেশ'-এ প্রকাশিত 'সরগমের নিখাদ'-এর কিস্তিতে দেখি শচীনবাবু বলছেন যে, অজয় ভট্টাচার্য কলকাতায় আসার পর কেবলমাত্র তিনিই শচীনবাবুর জন্য গান রচনা করতেন। কিন্তু অজয়বাবু জীবিত ও কলকাতায় থাকার সময়ও শচীনবাবু অন্য গীতিকারের লেখা গান গেয়েছেন; দৃষ্টান্তস্বরূপ শৈলেন রায়ের লেখা বিখ্যাত 'প্রেমের সমাধি-তীরে' (১৯৪০ সালে রেকর্ড হয়) গানটির উল্লেখ করতে পারি। ঐ কিস্তিতেই শচীনবাবু লিখেছেন যে, "খুব সম্ভব ১৯৪৭ সাল থেকে" তিনি হিজ মাস্টার্স ভয়েস-এ রেকর্ড করছেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালের পরও শচীনবাবু হিন্দুস্থান রেকর্ডে সাতটি গান (রেকর্ড নং H 1231, H 1320, H 1321, H 1328, H 1340, H 1384, H 1437 বেরিয়েছে। শচীনবাবু এইচএমভি-তে যোগদান করেন ঐ সালের অনেক পরে। ৭/৩/৭০ ও ১৪/৩/৭০ তারিখের 'দেশ'-এ কয়েকজন পত্রলেখক শচীন দেববর্মণের ফিল্মের গান সম্বন্ধে ভুল কথা লিখেছেন। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার বিশ্বাস (৭/৩/৭০-এ) লিখেছেন যে, শচীনবাবু 'মরণ তোদের ডাকে আজ' ও 'সাজে নওল-কিশোর চাঁদের তিলকে আজ' এই দুটি গান ফিল্মে গেয়েছিলেন। কিন্তু 'মরণ তোদের ডাকে আজ' বলে শচীনবাবুর গাওয়া কোন গান নেই; দিলীপবাবু বোধহয় 'মাটির ঘর' ফিল্মের 'শ্যামরূপ ধরিয়া এসেছে মরণ' গানটির ভাষাকেই গোলমাল করে ফেলে এইভাবে দাঁড় করিয়েছেন। 'সাজে নওল-কিশোর' গানটি অবশ্য শচীনবাবু 'রাজগী' ফিল্মে গেয়েছিলেন। শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (৭/৩/৭০-এ) লিখেছেন শচীনবাবু জীবনে একটি মাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীত— 'মিলন রাতি পোহাল'— গেয়েছিলেন কোন ফিল্মে এ কথা সর্বৈব ভুল। শচীন দেববর্মণ কর্তৃক সুর-সংযোজিত 'প্রতিকার' ফিল্মে (ঐ ফিল্মেই গোপালবাবু কর্তৃক উল্লিখিত 'যদিও পরীরা ভুলেও কখনও রাতে' গানটি ছিল) 'মিলন রাতি পোহাল' গানটি সন্নিবিষ্ট হয়েছিল বটে, কিন্তু গানটি শচীন দেববর্মণ গান নি, গেয়েছিলেন জনৈকা মহিলা শিল্পী (তখন ফিল্মের প্লে-ব্যাক আর্টিস্টদের নাম বিজ্ঞাপিত হত না)— ঐ ফিল্মের 'ডালিয়া' নামে এক নারী চরিত্রের গান এটি, ঐ চরিত্রের

অভিনেত্রী ছিলেন শ্রীমতী বন্দনা। শচীন দেববর্মণ জীবনে কোনদিন কোন ফিল্মে বা রেকর্ডে রবীন্দ্রসঙ্গীত গান নি। শ্রীযুক্ত মিহিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৪/৩/৭০-এ) লিখেছেন যে, 'সমর' ছবির 'সুন্দরী লো সুন্দরী' গানটি শচীন দেববর্মণ গেয়েছিলেন। কিন্তু তা ঠিক নয়; 'সুন্দরী লো সুন্দরী' গানটি ছিল বহু নারী ও পুরুষের মিলিত কণ্ঠে গীত 'কোরাস' গান, তার মধ্যে শচীন দেববর্মণের কণ্ঠ ছিল না। গানটির রেকর্ডেও অন্য শিল্পীদের নাম লেখা আছে। শচীনবাবু 'সমর' ছবির সুরকার, তার কোন গানের গায়ক নন।

দেশ : ১৪ চৈত্র ১৩৭৬

সুখময় মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন

॥ ৮ ॥

শ্রীশচীন দেববর্মণ বাংলা কথাচিত্রে নিজ কণ্ঠে অন্তত তেরটি গান গেয়েছিলেন। সেই গানগুলি হল এই— 'ওরে সুজন নাইয়া' (অজয় ভট্টাচার্য)— সাঁঝের পিদিম (১৯৩৫), 'ওরে বন্ধুরে মনের কথা কইবার আগে' (অজয় ভট্টাচার্য)— রাজগী (১৯৩৭), 'বাঁশুরিয়ারে কোথায় শিখেছ বাঁশি বাজান' (অজয় ভট্টাচার্য)— রাজকুমারের নির্বাসন (১৯৪০), 'বিদেশীরে উদাসীরে, ফিরে যাও তুমি' (অজয় ভট্টাচার্য)— এ পার ও পার (১৮৪১), 'ওরে অবোধ নেয়ে' এবং 'কি মায়া লাগলো চোখে' (প্রেমেন্দ্র মিত্র)— প্রতিশোধ (১৯৪১), 'চোখ গেল চোখ গেল কেন ডাকিস রে' (কাজী নজরুল)— নন্দিনী (১৯৪১), 'কে যেন কাঁদিছে আকাশ ভুবনময়' (প্রণব রায়)— নারী (১৯৪২), 'জনমদুঃখিনী সীতা' এবং 'বাংলার মেয়ে, বাংলার বধূ গাহি যে তোমার গান' (শৈলেন রায়)— জীবন-সঙ্গিনী (১৯৪২), 'বন্দর ছাড়ো যাত্রীরা সবে জোয়ার এসেছে আজ' (অজয় ভট্টাচার্য)— ছদ্মবেশী (১৯৪৪), 'কাল সাগরের মরণ দোলায়' এবং 'শ্যামরূপ ধরিয়া এসেছে মরণ' (শৈলেন রায়—মাটির ঘর (১৯৪৪)।

এর মধ্যে 'চোখ গেল চোখ গেল' গানটির সুরকার কাজী নজরুল, যদিও নন্দিনী কথাচিত্রের সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন সুরসাগর হিমাংশু দত্ত। 'কে যেন কাঁদিছে আকাশ ভুবনময়' গানটির সুর রাইচাঁদ বড়ালের এবং তিনিই নারী কথাচিত্রের সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন। কিন্তু 'উদাসীরে বিদেশীরে ফিরে যাও তুমি' গানটির সুর শিল্পীর নিজেরই দেওয়া, যদিও এ পার ও পার কথাচিত্রের সঙ্গীত পরিচালক এবং তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন যথাক্রমে বিনোদ গঙ্গোপাধ্যায়

এবং রাইচাঁদ বড়াল। আর দুটি গানের সুর, যথা 'জনম দুখিনী সীতা' এবং 'বাংলার মেয়ে, বাংলার বধূ' দিয়েছিলেন সুরসাগর হিমাংশু দত্ত এবং তিনিই জীবন-সঙ্গিনী কথাচিত্রের সঙ্গীত পরিচালকও ছিলেন। বাকী গানগুলি সবই শিল্পী নিজের সুরেই গেয়েছেন। সুতরাং দেশ পত্রিকার ৭ই ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় (পৃষ্ঠা ১৭৮) শিল্পীর উক্তি— 'এই গানটি (চোখ গেল, চোখ গেল) ছাড়া আমি অন্য কারো সুরে কোন গান চলচ্চিত্রে গাই নি, একমাত্র নিজের রচিত সুর ছাড়া'— তথ্যের দিক থেকে নির্ভুল নয়, অবশ্য দীর্ঘদিনের ব্যবধানে শিল্পীর বিস্মৃতি ঘটা অসম্ভব নয়।

'সাজে নওল কিশোর' গানটি আমি যতদূর জানি কোন কথাচিত্রের নয়, তবে গ্রামোফোন রেকর্ডে ধৃত এর অপর পিঠের গানটি 'ওরে বন্ধুরে মনের কথা কইবার আগে' রাজগী কথাচিত্র হতে গৃহীত। শিল্পীর হিন্দুস্থান গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রকাশিত রেকর্ডের মধ্যে এই তেরটি গানও আছে এবং সম্ভবত আজও পাওয়া যায়।

দেশ : ১৪ চৈত্র ১৩৭৬

কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্য
হাওড়া-৪

ছবি

কুমিল্লার এই বাড়িতে জন্মেছিলেন শচীন দেব। বাড়িটি এখন জরাজীর্ণ, পরিত্যক্ত

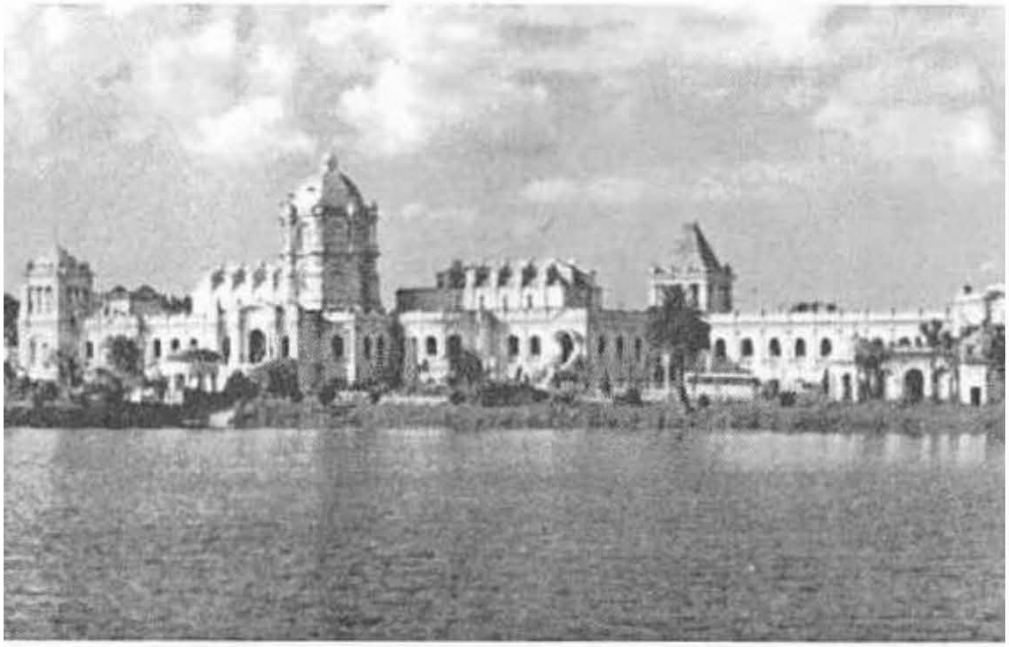

ত্রিপুরার উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ, শচীন দেব এই রাজপরিবারেরই সন্তান

ছোটবেলায় শচীনদেব

যুবক শচীনদেব

বিবাহবাসরে শচীনকর্তা ও মীরা দেবী

শচীন দেববর্মন

এইচএমভির লং প্লে
রেকর্ডের প্রচ্ছদ

শচীন দেববর্মনের হিন্দি গানের
রেকর্ড-লেবেল ও কভার

'হিন্দুস্থান রেকর্ড' প্রকাশিত শচীনকর্তার প্রথম রেকর্ড

এইচএমভি প্রকাশিত শচীনকর্তার
গানের রেকর্ড-লেবেল

এইচএমভি প্রকাশিত শচীনকর্তার
গানের রেকর্ড-লেবেল

শচীন ও রাহুল

স্ত্রী মীরা দেবীর সঙ্গে শচীনদেব

নির্দেশনার একটি বিশেষ মুহূর্তে

শচীন দেববর্মন ও লতা মঙ্গেশকর

আলিঙ্গনাবদ্ধ শচীনদেব ও কিশোর কুমার

ডান দিক থেকে : কিশোর কুমার, শচীন দেববর্মন, দেব আনন্দ, লতা মঙ্গেশকর।
সর্ব বাঁয়ে : রাহুল দেববর্মন (*প্রেম পূজারী* ছবির রেকর্ডিংয়ে)

শচীনদেব-মোহম্মদ রফি

বাঁ থেকে : আশা ভোঁসলে, রাহুল দেববর্মন, মীরা দেবী ও শচীন দেববর্মন